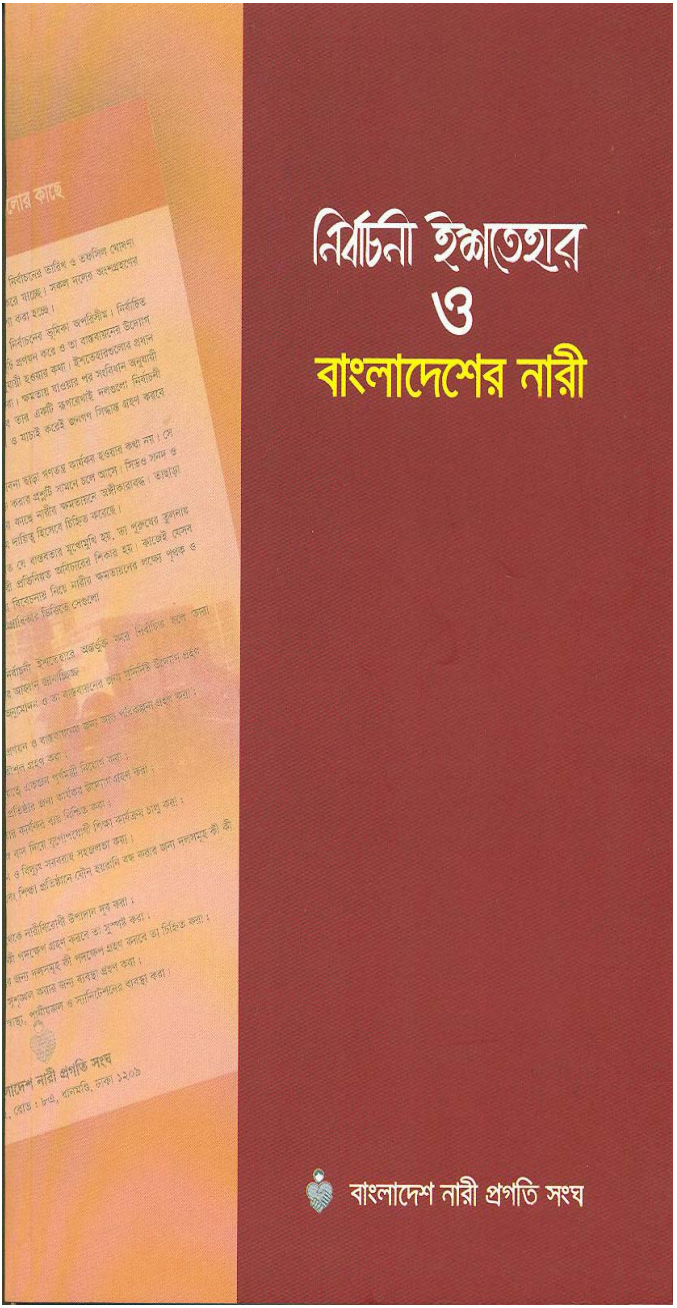
নির্বাচনী ইশতেহার
ও
বাংলাদেশের নারী
বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ

গ্রন্থনা
শাহনাজ সুমী
দিলারা রেখা

সম্পাদনা
রোকেয়া কবীর

নির্বাচনী ইশতেহার ও বাংলাদেশের নারী

প্রকাশকাল
জুন ২০০৯

স্বত্ব
বিএনপিএস

প্রকাশক
বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ (বিএনপিএস)
কল্পনা সুন্দর, ১৩/১৪ বাবর রোড (দ্বিতীয় তলা), ব্লক বি
মোহাম্মদপুর হাউজিং এস্টেট, ঢাকা ১২০৭
ফোন : ৮১১১৩২৩, ৮১২৪৮৯৯, ফ্যাক্স : ৯১২০৬৩৩
ই-মেইল : bnps@bangla.net
ওয়েবসাইট : www.bnps.org

প্রচ্ছদ ও মুদ্রণ
যোগসূত্র

দাম
৬০ টাকা

ISBN: 978-984-8834-01-5

Election Menifesto of various political parties and Women of Bangladesh prepared by Shahnaz Sumi & Dilara Rekha and edited by Rokeya Kabir, published by Bangladesh Nari Progati Sangha in June 2009

সূচিপত্র

মুখবন্ধ

পটভূমি

প্রেক্ষাপট
উদ্দেশ্য
পদ্ধতি

বাংলাদেশের নারীসমাজ

নারীর অগ্রগতি ও অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় নারীর অংশগ্রহণ
সংরক্ষিত আসনে প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচনের দাবি
বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর অবস্থান
বাংলাদেশের সংবিধান এবং নারীর রাজনৈতিক অধিকার
বিভিন্ন আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার
আন্তর্জাতিক সনদের ভিত্তিতে জাতীয় কর্মসূচি
দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র
জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা
২০০৮ সালে ঘোষিত নারী উন্নয়ন নীতিমালার ইতিবাচক দিকসমূহ

নির্বাচনী ইশতেহারে নারী

নারীসমাজের ২০০৮-এর সাধারণ নির্বাচনপূর্ব আন্দোলন ও দাবি
নারীর ক্ষমতায়নে রাজনৈতিক দলসমূহের অঙ্গীকার
২০০৮-এর নির্বাচনে বিভিন্ন দলের ইশতেহারে নারী ইস্যু
নির্বাচনী ইশতেহার ২০০৮-এর তুলনামূলক বিশ্লেষণ : নারীর ক্ষমতায়ন প্রসঙ্গ
নারী প্রসঙ্গ : অতীতের নির্বাচনী ইশতেহার ও ২০০৮-এর নির্বাচন

উপসংহার

তথ্যসূত্র

মুখবন্ধ

নারীর চোখে রাজনৈতিক দলসমূহের নির্বাচনী ইশতেহারের বিশ্লেষণ নারীর ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়ায় একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ইশতেহারের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক দলগুলো তাদের অঙ্গীকার ব্যক্ত করে। আর এই অঙ্গীকারগুলো নারী আন্দোলনের পরিকল্পনা, দিক-নির্দেশনা, কৌশলগত পরিবর্তন, পরিবর্ধন প্রক্রিয়ার অন্যতম উৎস। প্রতিবারই আমরা দেখতে পাই ইশতেহার ঘোষণার পরপরই রাজনীতি আর অর্থনীতি বিশ্লেষকগণ গুরুত্বের সঙ্গে দলগুলোর ইশতেহার বিশ্লেষণ করেন। এসব আলোচনায় নারীর ক্ষমতায়নের প্রশ্নটি বর্তমানে খণ্ডিত আকারে হলেও কিছুটা স্থান পাচ্ছে— এটি একটি আশার দিক।

অন্যদিকে অতীত অভিজ্ঞতায় আমরা দেখেছি, আমাদের দেশের নির্বাচন-সংস্কৃতিতে ইশতেহার প্রকাশ করা রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে আনুষ্ঠানিকতা মাত্র। জনগণের কাছে বিষয়টি অজানা নয়। এ বাস্তবতায় গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে সচল রাখার স্বার্থে রাজনৈতিক দলগুলোকে তাদের অঙ্গীকারের প্রতি দৃষ্টি ফেরাতে উদ্বুদ্ধ করা এবং ইশতেহার প্রশ্নে তাদের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। কারণ নারীর ক্ষমতায়ন প্রতিষ্ঠার জন্য অঙ্গীকার ও সে অঙ্গীকার বাস্তবায়নের কাজটি রাজনৈতিক। আর তাই চূড়ান্ত বিচারে তা কেবল রাজনৈতিক দলই করতে পারে। তবে আশার কথা বর্তমান সরকার তার নির্বাচনী ইশতেহারের ওয়াদা পূরণের বিষয়টি বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের সময় বারবারই উল্লেখ করছে এবং জনগণও আগের তুলনায় অধিক হারে নির্বাচনী অঙ্গীকারের বিষয়টি সরকারকে মনে করিয়ে দিচ্ছেন।

বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ বরাবরের মতো এবারও রাজনৈতিক দলগুলোর ইশতেহার বিশ্লেষণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। আশা করি এই উদ্যোগ নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে ইশতেহারে কৃত অঙ্গীকার বাস্তবায়নে রাজনৈতিক দলগুলোকে দায়বদ্ধ করে তুলতে সহায়তা করবে, যা হয়ত নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে।

রোকেয়া কবীর
নির্বাহী পরিচালক

পটভূমি

প্রেক্ষাপট

একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠু জাতীয় নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠিত হয় বলে নির্বাচনের ভূমিকা অপরিসীম। নির্বাচনে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে জনগণ তাদের গণতান্ত্রিক অধিকারের চর্চা ও প্রয়োগ করে, প্রতিনিধি নির্বাচন করে, রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশগ্রহণ করে। নির্বাচনের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় নীতিনির্ধারণ ও তা বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার ওপর জনগণের কার্যকর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। আর নির্বাচিত সরকার সংবিধান অনুযায়ী দেশ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করার পাশাপাশি জনকল্যাণে বিভিন্ন নীতি ও কর্মসূচি গ্রহণ করে ও তা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়।

নির্বাচনের আগে অংশগ্রহণকারী দলগুলো তাদের অঙ্গীকার জনমানুষের সামনে তুলে ধরে। ইশতেহারের প্রধান বিষয় হয় দলসমূহের উন্নয়ন দর্শন। উদ্দেশ্য, জনগণকে তাদের পক্ষে মত প্রদানে আকৃষ্ট করা। এ লক্ষ্যে প্রার্থী বা দল জনমত গঠনের লক্ষ্যে লিখিত বা অলিখিত অঙ্গীকার ব্যক্ত করে। যদিও আমাদের দেশে সরকার গঠনের পর দলগুলোর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে ইশতেহারের অঙ্গীকার প্রতিফলনের প্রবণতা খুব একটা দৃশ্যগোচর হয় না। এজন্যই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে সচল রাখার স্বার্থে রাজনৈতিক দলগুলোকে তাদের অঙ্গীকারের প্রতি দৃষ্টি ফেরানোর আবশ্যকতা রয়েছে। ঘোষিত ইশতেহারের মাধ্যমে রাজনৈতিক দলগুলোর অঙ্গীকারের ব্যাপারে জনগণের কাছে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করবার প্রয়োজনীয়তাও এক্ষেত্রে উপেক্ষণীয় নয়।

বাংলাদেশ একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, যার অর্ধেক নাগরিকই নারী। কাজেই নারীর সমান অংশগ্রহণ ছাড়া গণতন্ত্র কার্যকর হওয়ার কথা নয়। তাছাড়া গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান এবং জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিও নারীর ক্ষতায়নের অনুকূলে সমর্থন দেয়। রাষ্ট্র নারী-পুরুষ বৈষম্য দূরীকরণে সংবিধান ও বিভিন্ন সনদের মাধ্যমে নাগরিকদের কাছে দায়বদ্ধ। তাই আদর্শগতভাবে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র পরিচালনায় নারী ও পুরুষ উভয়েরই সমানভাবে অংশ নেয়ার কথা। কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন। বাংলাদেশের সংবিধানে নারীর সমানাধিকারের কথা স্পষ্টভাবে স্বীকৃত থাকলেও অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও আইনগত ক্ষেত্রে নারী এখনো শোষণ ও বৈষম্যের শিকার। নারীকে মানুষ হিসেবে দেখা হয় না, দেখা হয় ভোগ্যপণ্য ও সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র হিসেবে। বিভিন্ন সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে তথা সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় দরিদ্র জনগোষ্ঠী ও নারীদের অংশগ্রহণ খুবই সীমিত। অশিক্ষা, কুসংস্কার, ধর্মের অপব্যাখ্যা দিয়ে এখনো নারীর ওপর চালানো হচ্ছে নির্মম অত্যাচার ও নির্যাতন, যা মধ্যযুগীয় বর্বরতাকেও হার মানায়। এর ফলে একদিকে যেমন পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে অধিকারহীনতার সংকট তৈরি হয়েছে, অন্যদিকে উন্নয়ন প্রক্রিয়াও বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। ফলে রাষ্ট্র বঞ্চিত হচ্ছে অর্ধেক জনগোষ্ঠীর মূল্যবান অবদান থেকে। অপরদিকে পুরুষতান্ত্রিককতার বেড়াজালে আক্রান্ত অর্থশাস্ত্রে বা অর্থনৈতিক মানদণ্ডে বিবেচিত না-হওয়ায় পরিবার, সমাজ ও

রাষ্ট্রের উন্নয়নে নারীর অবদান অদৃশ্য থেকে যাচ্ছে; অথচ বাইরের বিশ্বের কাছে বাংলাদেশের সাফল্যের যে ইতিহাস— ক্ষুদ্রঋণ, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, গার্মেন্ট শিল্প, চা, চিংড়ি প্রভৃতির প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই মূল অবদান নারীর। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান রাজনৈতিক দলসমূহে নারীর অংশগ্রহণ কম থাকায় নারী যেমন তার সিদ্ধান্ত নিতে ব্যর্থ হচ্ছে, তেমনি জেন্ডার সংবেদনশীলতার অভাব বা পুরুষের আধিপত্য থেকেই যাচ্ছে সকল ক্ষেত্রে। এ কারণে বাংলাদেশের সংবিধান এবং বিভিন্ন নীতিমালায় নারীর সমঅধিকার ও সমঅংশীদারিত্বের কথা স্বীকৃত থাকলেও রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানে সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ এখনো সীমিত রয়ে গেছে।

নারী-পুরুষ সমতা বা নারীর ক্ষমতায়ন প্রতিষ্ঠার জন্য অঙ্গীকার ও সে অঙ্গীকার বাস্তবায়নের কাজটি রাজনৈতিক দলের সদিচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। সাধারণ নাগরিকরা তাদের প্রতিদিনের জীবনযাত্রার অভিজ্ঞতা থেকে সমস্যা ও সংকটগুলোর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করতে পারে, কিছুটা হলেও জনমত গঠন করতে পারে; কিন্তু সমস্যার সমাধান রাজনৈতিক দলের হাতেই। নীতি গ্রহণ ও তা বাস্তবায়ন শেষ বিচারে রাজনৈতিক দলই করে থাকে। সে কারণেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী অঙ্গীকারের সঙ্গে নারীর ক্ষমতায়নকে সম্পৃক্ত করার প্রশ্নটি সামনে চলে আসে। নারী অধিকার ছাড়া মানবাধিকার অর্থহীন— একথা আজ বিশ্বস্বীকৃত। নারীর প্রতি সকল ধরনের বৈষম্য বিলোপ (সিডও) সনদ ও প্লাটফরম ফর অ্যাকশন (পিএফএ)-এ সম্মতির কারণে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে নারীর ক্ষমতায়নে অঙ্গীকারাবদ্ধ। সে কারণেই দরিদ্র, সংখ্যালঘু, আদিবাসী, প্রতিবন্ধীসহ সকল নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সুস্পষ্ট রাজনৈতিক অঙ্গীকার বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ইশতেহারে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। পাশাপাশি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য বাস্তবমুখী পদক্ষেপের কথাও উল্লেখ থাকা দরকার।

এক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলসমূহের জেন্ডার সচেতনতা ও সংবেদী উপলব্ধি একান্ত জরুরি। দলের মধ্যে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ ও নেতৃত্বের বিকাশ ঘটানোই প্রাথমিক কাজ। একই সাথে নারীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় আইনকানুনের পরিবর্তনও আবশ্যক। সে কারণেই বিভিন্ন নারী সংগঠন ও নাগরিক গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে জাতীয় সংসদে নারীদের জন্য এক তৃতীয়াংশ আসন বরাদ্দের দাবি উত্থাপিত হয়েছে। তাছাড়া এই আসনগুলোয় সরাসরি নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথাও জোর দিয়ে বলা হচ্ছে। সমাজের সকল অংশের সমঅংশগ্রহণ যদি গণতন্ত্রের মর্মবস্তু হয়ে থাকে, তাহলে সংসদে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির প্রস্তাব আমাদের বিদ্যমান ব্যবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তনের ইঙ্গিতবহ।

২০০৮ সালের হিসেব মতে, বাংলাদেশে মোট ভোটারের সংখ্যা ৮ কোটি ১০ লাখ ৫৮ হাজার ৬৯৮ জন। এর মধ্যে নারী ভোটার ৩ কোটি ৯৮ লাখ ২২ হাজার ৫৪৯ জন। অর্থাৎ পুরুষ ভোটারের চেয়ে নারী ভোটারের সংখ্যা ১৪ লাখ ১৩ হাজার ৬০০ জন বা

পৌনে দুই শতাংশ বেশি। এ পরিসংখ্যানটি বলে দেয় যে, যেকোনো ধরনের নির্বাচনে নারী ভোটারের গুরুত্ব কতটা বেশি।

পুরুষের চেয়ে নারীর সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আইনগত চাহিদা অনেক ভিন্ন। অর্থাৎ নিজের ভূমিকা ও দায়িত্ব পালন করতে বা প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে নারী যেসব

বাস্তবতার মুখোমুখি হয়, তা পুরুষের তুলনায় ভিন্ন। সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও আইনগত ক্ষেত্রে নারী প্রতিনিয়ত অবিচারের শিকার হয়। এ বাস্তবতা নারীর রাজনৈতিক সিদ্ধান্তগ্রহণের ওপরও বিরাট প্রভাব ফেলে। যেসব রাজনীতিবিদ নারী ভোটারের সমর্থন আশা করেন, তাদের অবশ্যই এ বিষয়টি মনে রাখতে যে নারীদের কেবল ভোটার বলে বিবেচনা করা ঠিক নয়। রাজনীতিবিদদের মনে রাখতে হবে যে, নারী হলো সদাসতর্ক সিদ্ধান্তগ্রহণকারী, যার ওপর দেশের উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং তাদের নিজেদের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। অর্থাৎ—

- রাজনৈতিক দলগুলো যদি অর্ধেক নাগরিক হিসেবে নারীদের ভোট চায়, তাহলে অবশ্যই সমান মর্যাদাবান নাগরিক হিসেবে নারীর প্রয়োজনগুলো উপলব্ধি করতে হবে এবং সে ব্যাপারে ইতিবাচক সাড়া দিতে হবে;

- রাজনীতিবিদদের অবশ্যই নারী-পুরুষ বৈষম্যের কারণ উদঘাটন করতে হবে এবং এর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ফলাফল কী হতে পারে, তা অনুধাবন করতে হবে;

- নারীর প্রয়োজন ও অধিকারগুলোর দিকে নজর দেবার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলোর অবস্থানটি কী এবং এসব প্রয়োজন মেটানো ও অধিকার বাস্তবায়নে তারা কখন কোন ধরনের পদক্ষেপ নেবে নির্বাচনী ইশতেহারে তার উল্লেখ থাকতে হবে।

এ প্রসঙ্গে নারীর সাংবিধানিক অধিকার, নারীর অগ্রগতি ও অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় নারীর অংশগ্রহণ, নারীর বর্তমান অবস্থান এসবের পরিপ্রেক্ষিতে রাজনৈতিক দলসমূহের নির্বাচনী অঙ্গীকারগুলোর দিকে ফিরে তাকানো অত্যন্ত জরুরি।

উদ্দেশ্য

ক. প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহের নির্বাচনী ইশতেহারসমূহ কতটা জেন্ডারসংবেদী তা খতিয়ে দেখা;
খ. বিভিন্ন দলের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অঙ্গীকারে নারীর ক্ষমতায়ন প্রসঙ্গটি কীভাবে প্রতিফলিত তা খতিয়ে দেখা;
গ. নারীর ক্ষমতায়নের স্বপক্ষে বিশ্লেষণধর্মী জনমত তৈরি করা;
ঘ. নারীর ক্ষমতায়নের পক্ষে নীতিমালা নির্ধারণে পলিসি অ্যাডভোকেসি।

পদ্ধতি

ইশতেহার বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে গৃহীত কৌশলে নির্দিষ্ট কোনো একটি দলের সুনির্দিষ্ট অঙ্গীকারের ইতি-নেতি বিচারের পাশাপাশি এর সাথে সেই দলের অপরাপর অঙ্গীকার বিশ্লেষিত হয়েছে সার্বিক একটি অবস্থান দাঁড় করানোর স্বার্থে। খণ্ডিত বিশ্লেষণে কোনো দলের প্রকৃত রাজনৈতিক চরিত্রও বের হয়ে আসে না। এ বিষয়টি রেখেই পুরো বিশ্লেষণটিতে পূর্ণাঙ্গ দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়েছে।

প্রতিবেদনটিতে ১৯৯১, ১৯৯৬, ২০০১ ও ২০০৮— পরপর চার বছরে প্রকাশিত বাংলাদেশের প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহের নির্বাচনী ইশতেহার পর্যালোচনা করা হয়েছে। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি), বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি (এরশাদ), জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি ও বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি— এই দলসমূহের নির্বাচনী ইশতেহারের জেন্ডার দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ ঠাঁই পেয়েছে এ প্রতিবেদনে।

ইশতেহার বিশ্লেষণে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে নারীসমাজের জীবনজীবিকার সঙ্গে একীভূত খাতসমূহে দলগুলোর অঙ্গীকারে। বিশ্লেষণে বাংলাদেশের সংবিধান, জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা, নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ (সিডও সনদ), বেইজিং প্লাটফরম ফর অ্যাকশন, দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র (পিআরএসপি) এবং বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়ন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রকাশনা ও দলিল এবং বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ ব্যবহৃত হয়েছে।

নারীর অগ্রগতি ও অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় নারীর অংশগ্রহণ

নারী ও পুরুষ নিয়ে গঠিত আমাদের এই মানবসমাজ। সমাজ-রাষ্ট্রের অগ্রগতি ও উন্নয়নের সাথে নারী ও পুরুষ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। দেশের মোট মানবসম্পদের প্রায় অর্ধেক নারী। সমাজে নারীর কার্যকর অংশগ্রহণ ছাড়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পূর্ণতা পেতে পারে না। তাই সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য হ্রাসের লক্ষ্যে নারীর ক্ষমতায়ন এবং সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ কারণেই বর্তমানে সকল উন্নয়ন কর্মকৌশল প্রণয়নে নারীর ক্ষমতায়ন এবং জেন্ডার সমতার বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে।[১] এতদসত্ত্বেও শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, সম্পদের ওপর অধিকার, নিরাপত্তা, সামাজিক ও রাজনৈতিক পর্যায়ে অংশগ্রহণ ইত্যাদি বিষয়ে নারী ও পুরুষের মধ্যে এখনো বৈষম্য বিদ্যমান।

সত্যিকার অর্থে আমরা যদি নারীর কল্যাণ চাই, সামাজিক উন্নতি ও অগ্রগতি চাই তাহলে নারীর ক্ষমতায়ন, বিশেষ করে রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের কোনো বিকল্প নেই। নারীর ক্ষমতায়ন বলতে সবাই যে একই ধারণা পোষণ করেন তা বোধহয় সত্য নয়। অনেকেই রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ওপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেন এজন্য যে, শাসন ব্যবস্থাতেই নীতি-কৌশল নির্ধারিত হয়, তাই রাজনৈতিক ক্ষমতা বলয়ের কাছে থাকলেই কেবল নারী প্রগতির ইস্যুগুলোকে সামনে আনা সম্ভব হয়।

বাংলাদেশের সংবিধানে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সব নাগরিককে রাষ্ট্রীয় ও জনজীবনে সমান অধিকার প্রদান করা হয়েছে। রাষ্ট্রপতি, স্পিকার, জাতীয় সংসদ সদস্য ও মন্ত্রী পদে নির্বাচিত হওয়ার সমান অধিকার প্রত্যেক নারী-পুরুষের আছে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এসব পদে নারীর অংশগ্রহণ নগণ্য। বস্তুত বাংলাদেশের নারীরা রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতাহীন। নানা কারণে নারী রাজনৈতিক ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত এবং পুরুষের তুলনায় বৈষম্যের শিকার। এর প্রধান কারণ পুরুষতান্ত্রিক সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ। যে কারণে আমাদের দেশে দীর্ঘ প্রায় ১৮ বছর একটানা সরকারপ্রধান হিসেবে নারীরা দায়িত্ব পালন করলেও নারীর কল্যাণে কার্যকর কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় নি। আমাদের দেশে যে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় কাজ করতে হয়, সেটি পুরুষপ্রধান এবং পুরুষের প্রতি পক্ষপাতমূলক ও নারীর জন্য বৈষম্যমূলক। রাজনৈতিক দল প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার উৎস, রাজনৈতিক দলগুলো সনাতন পুরুষসুলভ রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ দ্বারা পরিচালিত হয় এবং এটা রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণকে সরাসরি নিরুৎসাহিত না-করলেও উৎসাহিত করে না।

এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য সাম্প্রতিককালে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রস্তাবিত রাজনৈতিক দলের নিবন্ধনের একটি পূর্বশর্ত হিসেবে একটি রাজনৈতিক দলের নির্বাহী

[১] ড. কাজী খলীকুজ্জামান আহমদ, নারীর মর্যাদা ও অধিকার, যুগান্তর, ৩ মে, ২০০৮

কর্মকর্তা পদে এক-তৃতীয়াংশ নারী নেতৃত্বের কথা বলা হয়েছে। সংসদে নারীদের কার্যকর প্রতিনিধিত্ব সম্পর্কে নিবন্ধনে ইচ্ছুক প্রত্যেকটি দলের মনোনয়নের একটি নির্দিষ্ট অংশ (শুরুতে অন্তত ২০ ভাগ) নারীদের জন্য বরাদ্দ করার লিখিত অঙ্গীকার নেয়ার
প্রস্তাব করা হয়েছে। এছাড়া সংসদের মোট আসন সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ প্রত্যক্ষ ভোটে এবং এক-তৃতীয়াংশ প্রতিটি দলের প্রাপ্ত ভোটের অনুপাতে পরোক্ষভাবে নির্বাচন করারও
প্রস্তাব করা হয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলো এসব প্রস্তাব মেনে নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধিত হয়েছে। এবারের জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও তার ইতিবাচক প্রভাব লক্ষ করা গেছে। এবারই প্রথম উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী সরাসরি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন এবং বিজয়ীও হন, যা স্বাধীনতার পর সর্বাধিক।

বিগত দুটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নারীপ্রার্থীর অবস্থা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ১৯৯৬ সালে ৩৬ জন নারী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে মাত্র ৭ জন এবং ২০০১ সালে ৩৮ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে মাত্র ৬ জন নির্বাচিত হয়েছিলেন। সেই তুলনায় বর্তমান সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী নারীপ্রার্থীর সংখ্যা ৫৭-এ উন্নীত হয়, যার মধ্যে বিজয়ী হন মোট ১৯ জন। পরে অনুষ্ঠিত উপনির্বাচনে আরো একজন নারী সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন।

২০০৪ সালে অষ্টম সংসদে সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনীতে গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী এবং সংবিধানের ৬৫(৩) অনুচ্ছেদ অনুসারে সাধারণ নির্বাচনে বিভিন্ন দলের প্রাপ্ত আসনের আনুপাতিক হারে নারীদের জন্য সংরক্ষিত ৪৫টি আসন দলীয়ভাবে বণ্টন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অর্থাৎ এই সিদ্ধান্ত মতে, দলীয় কোটায় বিভিন্ন দল মনোনীত নারীপ্রার্থীরা সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। এর ফলে চলতি সংসদে নারী প্রতিনিধিত্বের সংখ্যা (১৯+৪৫+১)=৬৫-তে উন্নীত হয়েছে, যা বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে নারী প্রতিনিধিত্বের এ যাবৎকালের সমস্ত রেকর্ড ভঙ্গ করেছে।

এক নজরে জাতীয় সংসদে সাধারণ ও সংরক্ষিত আসনে নারী প্রতিনিধিত্ব চিত্র

নির্বাচনের বছর	নারীপ্রার্থীর হার %	সাধারণ আসনে সরাসরি ভোটে নির্বাচিত	উপনির্বাচনে নির্বাচিত	মোট নির্বাচিত নারী	সাধারণ আসনে নির্বাচিত নারীর শতকরা হার %	নারীর জন্য সংরক্ষিত আসন	সার্বিকভাবে সংসদে নারীর প্রতিনিধিত্ব %
১৯৭৩	০.৩	-	-	-	-	১৫	৪.৮
১৯৭৯	০.৯	-	২	২	০.৭	৩০	৯.৭
১৯৮৬	০.৩	৫	২	৭	১.৭	৩০	১০.৬
১৯৮৮	০.৭	৪	-	৪	১.৩	-	১.৩
১৯৯১	১.৫	৮*	১	৬	১.৭	৩০	১০.৬
১৯৯৬	১.৩	১১*	২	৭	২.৭	৩০	১১.২

২০০১	১.৯	১৩*	-	৬	২.০	-	২.০
২০০৯	৫.২	২১*	-	১৯	১৫.৭	৪৫	১৮.৫

**একাধিক আসনে নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিগণ নিয়ম অনুযায়ী একটি রেখে বাকি আসন ছেড়ে দেন।*

জাতীয় সংসদে সর্বাধিক সংখ্যক নারী সদস্যই শুধু এবার নির্বাচিত হন নি, মন্ত্রিসভায় নারী প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রেও এবার অতীতের সকল রেকর্ড ভঙ্গ হয়েছে। এবারই প্রথম বাংলাদেশের মন্ত্রিপরিষদে ৫ জন নারী গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পেয়েছেন। নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে এটাও একটা মাইলফলক নিঃসন্দেহে।

১৯৭২-২০০১ পর্যন্ত মন্ত্রিসভায় নারীর উপস্থিতি/প্রতিনিধিত্ব

মেয়াদ	ক্ষমতাসীন দল	মোট মন্ত্রীর সংখ্যা	নারীমন্ত্রীর সংখ্যা	নারীমন্ত্রীর হার %
১৯৭২-১৯৭৫	অওয়ামী লীগ	৫০	২	৪
১৯৭৬-১৯৮২	বিএনপি	১০১	৬	৫.৯
১৯৮২-১৯৯০	জাতীয় পার্টি	১৩৩	৪	৩
১৯৯১-১৯৯৬	বিএনপি	৩৯	৪	৭.৬
১৯৯৬-২০০১	আওয়ামী লীগ	৩৯	৪	৯.৫
২০০১-২০০৬	বিএনপি-জামায়াত জোট	৬০	৩	৫
২০০৯-২০১৪	আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোট	৩৮	৫	১৩.১

নারীমন্ত্রী ২০০৯*

ক্রম	নাম	পদমর্যাদা	মন্ত্রণালয়
১	শেখ হাসিনা	প্রধানমন্ত্রী	এছাড়াও তাঁর দায়িত্বে রয়েছে সংস্থাপন, প্রতিরক্ষা, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, ধর্ম, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত, মহিলা ও শিশু, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি মন্ত্রণালয়
২	মতিয়া চৌধুরী	মন্ত্রী	কৃষি মন্ত্রণালয়
৩	অ্যাডভোকেট সাহারা খাতুন	মন্ত্রী	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৪	ডা. দীপু মনি	মন্ত্রী	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৫	মুন্নুজান সুফিয়ান	প্রতিমন্ত্রী	শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়

** ২০০৯-এর ৩০ জানুয়ারি পর্যন্ত*

মোট ভোটারের সংখ্যা এবং ভোটদানের হারের ক্ষেত্রেও নারীরা এখন পুরুষের তুলনায় অগ্রগামী। কারণ পুরুষ ভোটারের চেয়ে নারী ভোটার ১৪ লাখ ১৩ হাজার ৬০০ জন তথা পৌনে দুই শতাংশ বেশি।

এছাড়া গত ২২ জানুয়ারি ২০০৯-এ অনুষ্ঠিত উপজেলা পরিষদের নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে ১৮ জন নারী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন ও একজন বিজয়ী হন। ভাইস চেয়ারম্যানের ৪৮১টি পদের জন্য মোট ২২১১ জন নারীপ্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ৪৮১ জন উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে জয়যুক্ত হয়ে এসেছেন।

নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে এগুলো নিঃসন্দেহে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ অর্জন। কিন্তু তারপরও আমাদের এখনো বহুপথ পাড়ি দিতে হবে। আর যতক্ষণ পর্যন্ত প্রত্যেক রাজনৈতিক দলে অন্তত ৩৩ ভাগ নারী নেতৃত্বে সমাসীন না-হবেন এবং অন্তত ১০০ আসনে প্রত্যক্ষভাবে নারীদের নির্বাচিত হওয়ার বিধান কার্যকর করা না-হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আনন্দিত হওয়ার কিছু নেই।

২০০৮-এর জাতীয় নির্বাচনে নারীপ্রার্থীরা কে কোথায় কত ভোটে জিতেছেন[২]

ক্রম	আসন	বিজয়ী/প্রাপ্ত ভোট	নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী/প্রাপ্ত ভোট
১	গোপালগঞ্জ-৩	শেখ হাসিনা (মহাজোট)– ১৫৮৯৫৮ ভোট	এস এম জিলানী (চারদল)– ৪৪৫১ ভোট
২	বাগেরহাট-১	শেখ হাসিনা (মহাজোট)– ১৪২৯৭৯ ভোট	শেখ ওয়াহিদুজ্জামান (চারদল)– ৫৮৫৩৩ ভোট
৩	রংপুর-৬ :	শেখ হাসিনা (মহাজোট)– ১৭০৫৪২ ভোট	নূর মোহাম্মদ মণ্ডল (চারদল)– ৩৮৬৭২ ভোট
৪	ফেনী-১	খালেদা জিয়া (চারদল)– ১১৪৪৮২ ভোট	ফয়েজ আহমেদ (মহাজোট)– ৫৮৫৫১ ভোট
৫	বগুড়া-৬	খালেদা জিয়া (চারদল)– ১৯৩৭৯২ ভোট	মোঃ মমতাজ উদ্দিন (মহাজোট)– ৭৪৬৩৪ ভোট
৬	বগুড়া-৭	খালেদা জিয়া (চারদল)– ২৩২৭৬১ ভোট	আলতাফ আলী (মহাজোট)– ৯২৮৩৩ ভোট
৭	ঢাকা-৪	সানজিদা খানম (মহাজোট)– ৯৭৮২৮ ভোট	আবদুল হাই (চারদল)– ৫২৭০১ ভোট
৮	ঢাকা-১৮	অ্যাডভোকেট সাহারা খাতুন (মহাজোট)– ২১৩৩৩২ ভোট	আজিজুল বারী হেলাল (চারদল)– ১১৬৭৮৬ ভোট
৯	গাজীপুর-৫	মেহের আফরোজ চুমকী (মহাজোট)– ১২৫৯০২ ভোট	এ কে এম ফজলুল হক মিলন (চারদল)– ৭৪৮৯৯ ভোট
১০	নারায়ণগঞ্জ-৪	সারাহ বেগম কবরী (মহাজোট)– ১৪১০৭৫ ভোট	মোঃ শাহ আলম (চারদল)– ১৩৮৬৮৬ ভোট
১১	ফরিদপুর-২	সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী (মহাজোট)– ১১৬৮৯৮ ভোট	শ্যামা ওবায়েদ ইসলাম (চারদল)– ৭৫৭২৬ ভোট

[২] প্রথম আলো, ৫ জানুয়ারি ২০০৯

১২	ফরিদপুর-৪	নিলুফার জাফরউল্লাহ (মহাজোট)– ১৫৭৪৯১ ভোট	মোস্তফা আমীর ফয়সাল (জাকের পার্টি)–৭০০৮৫ ভোট
১৩	শেরপুর-২	মতিয়া চৌধুরী (মহাজোট)– ১৫৬৯৭৩ ভোট	জাহেদ আলী চৌধুরী (চারদল)– ৭৫৬৩৭ ভোট
১৪	নেত্রকোনা-৪	রেবেকা মোমিন (মহাজোট)– ১০৮৭১৫ ভোট	লুৎফুজ্জামান বাবর (স্বতন্ত্র)– ৯১৯৮৪ ভোট
১৫	মুন্সীগঞ্জ-২	শাগুফতা ইয়াসমিন এমিলি (মহাজোট)– ১০৪৮৭৬ ভোট	মিজানুর রহমান সিনহা (চারদল)– ৮৭৩৫৮ ভোট
১৬	গাইবান্ধা-২	মাহাবুব আরা বেগম গিনি (মহাজোট)– ১৬৬৭২৬ ভোট	শফিকুর রহমান (চারদল)– ৪৮৬৮২ ভোট
১৭	সিরাজগঞ্জ-২	রুমানা মাহমুদ (চারদল)– ১২৮৪৩২ ভোট	জান্নাত আরা হেনরী (আওয়ামী লীগ)– ১২৬৩১১ ভোট
১৮	কুষ্টিয়া-৪	সুলতানা তরুণ (মহাজোট)– ১৩১৬২০ ভোট	সৈয়দ মেহদী আহমেদ রুমী (চারদল)– ১১৫৮৪২ ভোট
১৯	বাগেরহাট-৩	হাবিবুন নাহার (মহাজোট)– ৯৭০১৫ ভোট	মোঃ আব্দুল ওয়াদুদ শেখ (চারদল)– ৬৬১৭৭ ভোট
২০	সুনামগঞ্জ-৪	বেগম মমতাজ ইকবাল (মহাজোট)– ১২৩৮৮৩ ভোট	ফজলুল হক আসপিয়া (চারদল)– ৫৮৯৬৪ ভোট
২১	খুলনা-৩	বেগম মুন্নুজান সুফিয়ান (মহাজোট)– ৭৪৬৭৮ ভোট	কাজী মোঃ শাহ সেকেন্দার আলী (চারদল)– ৫৮১৭৭ ভোট
২২	চাঁদপুর-৩	ডা. দীপু মনি (মহাজোট)– ১৩৪৮৩৬ ভোট	জি এম ফজলুল হক (চারদল)– ১১৬০৬১ ভোট
২৩	কক্সবাজার-১	হাসিনা আহমেদ (চারদল)– ১৫৬৫১২ ভোট	সালাউদ্দিন আহমদ (মহাজোট)– ১২১১১ ভোট

রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ, নেতৃত্ব প্রদান ও মৌলিক অবদান মূলত নির্ভর করে দলের গঠনতন্ত্র, ঘোষণাপত্র ও সমাজের সর্বস্তরে নারীর সমঅংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রবেশগম্যতা সৃষ্টির ওপর। বাংলাদেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর কাঠামো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ঐতিহাসিকভাবে সকল রাজনৈতিক দল ও আদর্শ পুরুষতান্ত্রিক। দলের ঘোষণাপত্র বা গঠনতন্ত্রের কোথাও নারীর পরিপ্রেক্ষিত বা সমতার ইস্যুটি যথাযথ স্থান পায় নি— প্রধান সবগুলো দলেই রাজনীতি ও প্রশাসনে নারীর ভূমিকা অনুল্লেখ্য— নারীকে শুধু প্রান্তিক গোষ্ঠী হিসেবে, উপকারভোগী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও জাতীয় পার্টির গঠনতন্ত্রে নারী শাখার উল্লেখ থাকলেও মূল দল পরিচালনায় নারী অংশীদারিত্বের কোনো উল্লেখ নেই। বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি ও জামায়াতে ইসলামীর গঠনতন্ত্রে নারী শাখা গঠনেরও উল্লেখ নেই। সবচেয়ে হতাশার বিষয় হলো, মূল রাজনৈতিক দলগুলোর ইলেকশন মেনিফেস্টো বা নির্বাচনী ইশতেহারেও নারী ইস্যুটিকে একটি প্রান্তিক ইস্যু হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। আওয়ামী লীগের ঘোষণাপত্রে যুবশক্তি, অনুন্নত সম্প্রদায়, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সংরক্ষণ, পরিবেশ ইত্যাদি বিক্ষিপ্ত বিষয়ের সঙ্গে নারীর উন্নয়ন ও মর্যাদার প্রশ্নটি এসেছে। মূলত নারীর পশ্চাৎপদতা ও অসহায়ত্বের পরিপ্রেক্ষিতে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু নারীর ক্ষমতায়ন, মানবাধিকার ও

সমঅংশীদারিত্বের প্রশ্ন বিবেচনা করা হয় নি। বিএনপির ঘোষণাপত্রে 'নারীসমাজের সার্বিক মুক্তি ও প্রগতি'কে একটি বিশেষ লক্ষ্য হিসেবে চিহ্নিত করে নারীকে জাতীয় গঠনমূলক ও অর্থনৈতিক উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত করার কার্যক্রমের কথা বলা হলেও ক্ষমতার অংশীদারিত্বের প্রশ্ন বিবেচনা করা হয় নি। জাতীয় পার্টিও অনুরূপভাবে দারিদ্র্য বিমোচন ও অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্মে নারী সম্পৃক্ততার ঘোষণা দিয়েছে। জামায়াতে ইসলামী শরিয়া আইন ও ইসলামি আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে নারীর অধিকার রক্ষার ঘোষণা দিয়েছে। একমাত্র বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি তাদের ঘোষণাপত্রে সর্বক্ষেত্রে নারীর সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংবিধান, আইন, সামাজিক অনুশাসনের প্রতিক্ষেত্রে সংশোধন, সংযোজন ও সংস্কারের অঙ্গীকার ঘোষণা করেছে। এখানে উল্লেখ্য, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর যে তিনটি পার্টি ক্ষমতায় এসেছে এবং বিশেষ করে যে দুটি পার্টি নারী নেতৃত্বের মাধ্যমে দেশ শাসন করেছে, অর্থাৎ বিএনপি ও আওয়ামী লীগ— তারা কখনই নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ওপর গুরুত্ব দেয় নি। এমনকি এ ব্যাপারে তারা কোনো আইনি বা আদর্শগত পরিবর্তনের পদক্ষেপও গ্রহণ করে নি।

অন্যদিকে নারীসম্পৃক্ত বিশেষ ইস্যুসমূহ, যেমন নারীর প্রতি আইনি বৈষম্য, পুরুষের তুলনায় নারীশিক্ষার হার অর্ধেক হওয়া, দেশের মোট ৫.১ কোটি শ্রমশক্তির ২ কোটি নারী হওয়া সত্ত্বেও অর্ধেকের কম পারিশ্রমিক পাওয়া, নারীর স্বাস্থ্যসূচক পুরুষের তুলনায় অনেক নিম্ন হওয়া, গড় আয়ু কম হওয়া এবং বিশেষভাবে ক্রমবর্ধমান হারে যৌন হয়রানি, নারীর প্রতি পরিবারে ও সমাজে সহিংসতা বৃদ্ধি পাওয়া যা আজ নারীর প্রতি সহিংসতায় বাংলাদেশকে পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থান দিয়েছে (জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল রিপোর্ট)— এগুলো সবই গুরুত্বের দিক থেকে যেকোনো রাষ্ট্র পরিচালনাকারী নীতিনির্ধারক গোষ্ঠীর কাছে জাতীয় অগ্রাধিকারের ইস্যু, উন্নয়নের ইস্যু ও মানবাধিকার ইস্যু বলে বিবেচিত হওয়ার দাবি রাখে। উপরন্তু এগুলো নারীকেন্দ্রিক ইস্যু হওয়ায় নারীনেতৃত্ব এগুলো গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারবে বলে সমাজ আশা করে। কিন্তু আমাদের নারীনেতৃত্ব এগুলোকে শুধু প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ইস্যু হিসেবে চিহ্নিত করায় গত প্রায় দেড় দশকের নারীনেতৃত্ব এক্ষেত্রে কোনো উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে জেন্ডার বৈষম্যের কারণে বাংলাদেশের নারী তার পূর্ণ সম্ভাবনা নিয়ে বিকশিত হতে পারছে না বিধায়, আজও বাংলাদেশ সার্বিক উন্নয়ন সূচকে ১৫৪টি দেশের মধ্যে ১৪৬তম অবস্থানেই থেকে যাচ্ছে।

জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত আসনে প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবিটি দীর্ঘদিন ধরে উচ্চারিত হলেও এখনো তা উপেক্ষিতই রয়ে গেছে। রাজনৈতিক দলগুলো এ ব্যাপারে কোনো গরজ দেখায় নি। বরং এ প্রস্তাবের বাস্তবতা বা গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে পরোক্ষে প্রশ্ন তুলেছে। অথচ দেখা গেছে অন্যান্য নির্বাচনে নারীনেতৃত্ব বিকাশের ভাবনা থেকে বিপুল উৎসাহ এবং উদ্দীপনার সঙ্গে নির্বাচন সম্পন্ন করেছে। যেমন জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির আলোকে গৃহীত নারী উন্নয়নে জাতীয় কর্মপরিকল্পনার অংশ হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, সিটি করপোরেশন, উপজেলা পরিষদের

সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। নারীদের সাফল্য এক্ষেত্রে আশাতীত। সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন ওঠে যে, স্থানীয় সরকারের সর্বনিম্ন পর্যায়ে নারীদের জন্য সরাসরি ভোট গ্রহণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা গেলে আইনসভার আসনের জন্য করা যাবে না কেন ? এ প্রশ্নের উত্তর দেবার কেউ নেই। প্রত্যেকেই স্বীকার করেন যে এটি একটি জাতীয় দাবি। কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলোর এ কথার সঙ্গে কাজের মিল খুঁজে পাওয়া যায় না।

অথচ একথা অনস্বীকার্য নয় যে, প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হলে জনপ্রতিনিধি হিসেবে একজন নারীর দায়িত্ববোধ পূর্ণতা পায়। তিনি সচেতন হয়ে ওঠেন। এই সচেতনতার ফলে তিনি তাঁর যোগ্যতাকে প্রাধান্য দেবেন, তিনি জনগণকে যে প্রতিশ্রুতি দেবেন তা রক্ষা করবার জন্য বদ্ধপরিকর হবেন, নারীদের সমস্যাগুলো নিয়ে সংসদে আলোচনা করবেন এবং সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে একটি কার্যকর ভূমিকা পালনে ব্রতী হবেন। এভাবে না-হলে শুধু সংরক্ষিত আসনে মনোনয়ন লাভ করে কারো পক্ষেই মর্যাদার সঙ্গে কাজ করা সম্ভব নয়।

সংরক্ষিত আসনে প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচনের দাবি

জাতীয় সংসদে ৩০০ আসনের বিপরীতে ১৯ জন নারী সদস্যের উপস্থিতি কোনো বিশেষ তাৎপর্য বহন করে না। নারী সংগঠনগুলোর দাবি ছিল সরকারের এক তৃতীয়াংশ পদে নারীদের স্থান দেয়ার। সে দাবিকে সব সরকারই পাশ কাটিয়ে গেছে। স্বাধীনতার পরে এদেশের নারী আন্দোলনের কর্মীরা রাষ্ট্র পরিচালনায় নারীর সমঅংশীদারিত্ব নিশ্চিত করার জন্য সংরক্ষিত নারী আসনে সরাসরি নির্বাচনের দাবি তুলেছিল। কিন্তু সেই দাবিকে উপেক্ষা করে ১৯৭৩ সালের প্রথম জাতীয় সংসদে মাত্র ১৫টি আসন নারীদের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়। পরবর্তীকালে নারী আন্দোলনের চাপে সরকার সংরক্ষিত নারী আসন ১৫ থেকে বাড়িয়ে ৩০টি করে। ৮ম জাতীয় সংসদের মেয়াদকালের একেবারে শেষদিকে সংরক্ষিত আসনের মেয়াদ শেষ হলে বিএনপি-জামায়াত নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট সরকার মনোনয়ন পদ্ধতির কোনোরকম পরিবর্তন না-করেই দশ বছরের জন্য সংরক্ষিত নারী আসন সংখ্যা ৩০ থেকে বাড়িয়ে ৪৫-এ নিয়ে আসে।

নারীর জন্য সংরক্ষিত এই আসনগুলোতে পরোক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা ছিল। ৩০০ সাধারণ আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের পরে নির্বাচিত ৩০০ সংসদ সদস্যের পরোক্ষ ভোটে সংরক্ষিত আসনের জন্য নারী সদস্য নির্বাচিত হতেন। সংসদের ৩০০ সাধারণ আসনে নির্বাচিত সদস্যরা ছিলেন প্রায় সকলেই পুরুষ; কাজেই সংরক্ষিত নারী আসনের সকল নারী সদস্য বাস্তবে পুরুষ সংসদ সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হতেন। ফলে সংসদের সাধারণ আসনে যে রাজনৈতিক দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল, সেই দলের মনোনীত প্রার্থীদের নির্বাচন সুনিশ্চিত ছিল। বস্তুত নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসনগুলোতে কখনো ভোটাভুটি হয় নি; সকল সদস্য বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হতেন। সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত নারী সদস্যদের বেশিরভাগ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে তেমন সংযুক্ত ছিলেন না; তাদের তেমন রাজনৈতিক পটভূমিও ছিল না। নারী

আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ততা বা নারীর চাহিদা সম্পর্কে সচেতনতারও অভাব ছিল। মোটকথা, নির্বাচন বা মনোনয়ন দানের ব্যাপারে নারী উন্নয়ন কিংবা নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে অবদান আছে কি না, তা বিবেচনা করা হতো না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা বা দক্ষতা নয়, বরং রাজনৈতিক দলের ওপর মহলের পৃষ্ঠপোষকতা ও সুপারিশ মনোনয়নের চাবিকাঠি ছিল। মূলত সংরক্ষিত আসনগুলো ছিল শুধু আলংকারিক। কেননা রাজনৈতিক দলগুলো সংসদে প্রাপ্ত আসন অনুপাতে ওই সংরক্ষিত আসনগুলো ভাগাভাগি করে নেয়। এসব আসনে নারীরা মনোনয়নের মাধ্যমে সদস্য পদ পান বলে রাজনৈতিক দলের প্রতি তাদের অন্ধ আনুগত্য থাকে, কিন্তু থাকে না জনগণের প্রতি কোনো কার্যকর দায়বদ্ধতা।[৩]

বিগত সময়ে সংরক্ষিত আসনে পরোক্ষ পদ্ধতিতে নির্বাচিত বা মনোনীত হয়ে যাঁরা সংসদে গিয়েছিলেন, তাঁরা আর যা-ই হোন, বর্তমান বাংলাদেশের ব্যাপক নারী-পুরুষের প্রতিনিধি ছিলেন না। নারী আন্দোলনের এবং নারীর ক্ষমতায়নের মূল ইস্যুগুলো নিয়ে সংসদে দাবি তোলা, আলোচনা করার দায়বদ্ধতার কোনো প্রকাশও তাঁরা করতে পারেন নি। কারণ তাঁরা দায়বদ্ধ ছিলেন সংশ্লিষ্ট দল ও দলের কোটারি স্বার্থের কাছে।

দুর্বল রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ও নারীর স্বার্থের প্রতি অঙ্গীকারের অভাবের সঙ্গে পরোক্ষ নির্বাচনের অসুবিধা যুক্ত হয়ে সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত নারী সদস্যদের রাজনৈতিক প্রভাব খাটানোর ব্যাপারটি পঙ্গু হয়ে গিয়েছিল। সংসদে ও মন্ত্রিপরিষদে তাঁরা আশানুরূপ বা কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেন নি; পারেন নি নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে অবদান রাখতে।

নারী প্রতিনিধিরা মূলত দলের আসন সংখ্যা বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছে। সংসদে প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধীদলীয় নেত্রী নারী হওয়া সত্ত্বেও নারী সংসদ সদস্যদের বরাবরই বৈষম্যমূলক,
অধস্তন অবস্থানে থাকতে হয়েছে। আর তাছাড়া আমাদের দেশে নারীবিরোধী সংস্কৃতি অত্যন্ত শক্তিশালী হওয়ার কারণেও নারীনেতৃত্ব খুব একটা এগোতে পারে না। নারী সদস্যরা যাই করুন তাই নিয়ে সমালোচনা করার প্রবণতা লক্ষণীয়। নারীদের পোশাক, চুলের স্টাইল, কথা বলার ধরন, জীবনযাপন পদ্ধতি, ব্যক্তিগত আচার-আচরণ— সবই আলোচনা-সমালোচনার বিষয়। শুধু তাই নয়, বিবাহিত হলে 'পরিবারের প্রতি মনোযোগী নন' বলে অনেক ক্ষেত্রে অভিযুক্ত হন, আর অবিবাহিত হলে তার ওপর নানারকম কুৎসা ও চারিত্রিক কালিমা লেপন করা হয়। নারীবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে কথা বললে বলা হয়— উগ্রবাদী এবং মূল সমস্যার প্রতি অমনোযোগী। দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণজনিত সমস্যার বাইরে প্রাতিষ্ঠানিক সমস্যারও

---

[৩] Bangladesh Election Commission, "*Gender and the electoral process*", 2001-2003, p. 2.

শিকার হতে হয়েছে নারী সংসদ সদস্যদের। বাংলাদেশের কাজের পরিবেশ পুরুষ নিয়ন্ত্রণাধীন, যা নারীর জন্য বিশেষভাবে প্রতিকূল, যা সংসদ সদস্য নারীরা প্রতিনিয়ত উপলব্ধি করেছেন।

আর তাছাড়া পরোক্ষ নির্বাচন কখনো প্রত্যক্ষ নির্বাচনের বিকল্প হতে পারে না। বিশ্বের গণতান্ত্রিক সকল দেশে আইন পরিষদে নির্বাচন জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে, বয়স্কদের সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে হয়ে থাকে। কাজেই পরোক্ষ নির্বাচনে যে সকল নারী সদস্য হয়েছিলেন, তারা জনগণের সরাসরি ভোটে সাধারণ আসনে নির্বাচিত পুরুষ সদস্যদের সমক্ষমতা বা সমমর্যাদা দাবি করতে পারেন নি। প্রত্যক্ষ নির্বাচন থেকে যে রাজনৈতিক ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব অর্জন করা যায়, তার সঙ্গে পরোক্ষ নির্বাচনে প্রাপ্ত ক্ষমতার তুলনা হয় না।

একটি সংরক্ষিত নির্বাচনী এলাকা বস্তুত ১০টি প্রত্যক্ষ সাধারণ নির্বাচনী এলাকার সমান। সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত একজন নারী সদস্যের বিপরীতে একই নির্বাচকমণ্ডলি ও নির্বাচনী এলাকায় ১০ জন সরাসরি নির্বাচিত পুরুষ সদস্য ছিলেন। এমন বিসদৃশ পরিস্থিতিতে, নারী সদস্যগণ পুরুষ সদস্যদের অনুরূপ কর্তৃত্ব ও রাজনৈতিক ক্ষমতা দাবি করতে পারেন নি। দাবি আদায় করবার কথা ভাবতেও পারেন নি। একজন পুরুষ সদস্য তুলনামূলকভাবে ক্ষুদ্র নির্বাচকমণ্ডলির সঙ্গে যত নিবিড় ও কার্যকর সম্পর্ক বজায় রাখতে পারেন, দশগুণ বড়ো নির্বাচকমণ্ডলির সঙ্গে নারী সদস্য তত ফলপ্রসূ যোগাযোগ রাখতে সক্ষম নন। নির্বাচনী এলাকা যত বড়ো হবে, নির্বাচকমণ্ডলির সঙ্গে গণসংযোগ তত কম হতে বাধ্য। নির্বাচন যদি পরোক্ষ হয়, তবে গণসংযোগ আরো দুর্বল হয়ে পড়ে। স্বাভাবিকভাবেই সংরক্ষিত আসনের নারী সংসদ সদস্যবৃন্দ ক্ষমতার ভিত্তি গড়ে তুলতে পারেন নি, বরং ক্ষমতা ধারণ ও প্রয়োগ করতে অসমর্থ হয়েছেন। তাদের কার্যকরতা জনগণ উপলব্ধি করতে পারে নি। তারা আমাদের দেশের নারীর যে প্রধান সমস্যা— নারী নির্যাতন রোধ বা পরিবার ও পরিবারের বাইরে নারীর প্রতি সহিংসতা ও বৈষম্য দূর করবার ব্যাপারেও বিশেষ কোনো অবদান রাখতে পারেন নি।

এজন্য অবশ্যই নারী সংসদ সদস্য, মন্ত্রী ও রাজনীতিবিদদের দায়ী করা ঠিক নয়। যে রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং সনাতন ও ঐতিহ্যবাহী পুরুষ-প্রধান পরিবেশে তাদের কাজ করতে হয়, সে ব্যবস্থা ও পরিবেশ— উভয়ই নারীর ক্ষমতায়নে প্রতিবন্ধক এবং বৈষম্যমূলক। রাজনীতিতে অংশগ্রহণের জন্য অনুকূল পরিবেশ এবং অধিকতর সুযোগ সৃষ্টি করতে না-পারলে নারী রাজনীতিবিদগণ বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থায় প্রভাব খাটাতে অক্ষম হবেন এটাই স্বাভাবিক। নারীকে রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ করতে হলে রাজনৈতিক দলের কর্মকাণ্ডে প্রত্যক্ষ ও সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে হবে। কারণ সংসদীয় ব্যবস্থায় সরকার তথা মন্ত্রিপরিষদ এবং জাতীয় সংসদ উভয় প্রতিষ্ঠানের মূলে রাজনৈতিক দল।

এ অবস্থায় বাংলাদেশে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের সম্ভাবনা কতটুকু এবং সে সম্ভাবনা বাস্তবায়নের পথ কী— তা ভেবে দেখা দরকার। সার্বিক অবস্থা বিবেচনায় নিয়ে জাতীয় সংসদের সাধারণ আসনে অধিক সংখ্যক নারী সদস্যের নির্বাচনের মধ্যেই নারীর ক্ষমতায়নের সম্ভাবনা নিহিত। এই একটিমাত্র পদক্ষেপ রাজনৈতিক অঙ্গনে নারীর অবস্থান ও মর্যাদাকে অনেক উঁচুতে নিয়ে যেতে পারে এবং তা ক্রমান্বয়ে সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রকেও নারীর ক্ষমতায়নের অনুকূলে প্রভাবিত করতে পারে।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর অবস্থান

রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্পখাতের ৯০ শতাংশ শ্রমিকই নারী। কৃষি উৎপাদন খাতে নারীদের অবদান ৫০ ভাগ। নির্মাণশিল্পেও নারীরা ব্যাপকভাবে কাজ করছেন। এছাড়া ব্যবসায় ও শিল্প-উদ্যোক্তা হিসেবেও নারীরা ধীরে ধীরে উঠে আসছেন। এদের বাইরে দেশের বহু নারী গৃহপরিচারিকা হিসেবে কাজ করছেন।

এদিকে নানা ধরনের বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও চিকিৎসা, প্রকৌশল, শিক্ষকতা এবং সরকারি ও বেসরকারি কর্মক্ষেত্রে আজ নারীরা নিজেদের জন্য স্থান করে নিয়েছেন। এছাড়াও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে অসংখ্য নারী কাজ করছেন। এসবের ভিতর দিয়ে জাতীয় উন্নয়নে তারা রাখছেন বিশেষ অবদান। ঘরের বাইরের অর্থনৈতিক এসব খাত ছাড়াও নারীরা ঘরের কাজে ১০ থেকে ১৮ ঘণ্টা পর্যন্ত সময় ব্যয় করেন, যদিও এর কোনো নগদ অর্থমূল্য নেই।

শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান, সম্পদে মালিকানা, নীতিনির্ধারণ ও রাজনীতিতে অংশগ্রহণ, শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণ, দারিদ্র্যভোগ, নিরাপত্তাহীনতা, নির্যাতন, দুর্যোগের শিকার হওয়া ইত্যাদিতে নারী ও পুরুষের মধ্যে রয়েছে সুস্পষ্ট বৈষম্য।[৪]

রাজনীতি ও নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণ

এ দেশের ঔপনিবেশিক শাসন, পাকিস্তানি শাসন ও স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে এবং গণতান্ত্রিক অন্যান্য আন্দোলন-সংগ্রামে নারীর উজ্জ্বল উপস্থিতি পুরুষতান্ত্রিক ইতিহাস চর্চায় ঢাকা পড়ে আছে। দেশের দুটি রাজনৈতিক দলের শীর্ষে নারীনেতৃত্ব থাকলেও সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায়, অর্থাৎ দলের কেন্দ্রীয় কমিটিতে নারীর উপস্থিতি একেবারেই নগণ্য।

নিচের ছকে বাংলাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে নারী প্রতিনিধির সংখ্যা উল্লেখ করা হলো—

[৪] মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন, *গণতন্ত্রের পথেই অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি*, প্রকাশক : মাওলা ব্রাদার্স, দ্বিতীয় মুদ্রণ, মার্চ ২০০৭

দল	দলের গঠন-কাঠামো/কমিটি	মোট সদস্য	নারী সদস্য
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	জাতীয় স্ট্যান্ডিং কমিটি	১৫	১
	জাতীয় নির্বাহী কমিটি	১৬৪	১১
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	প্রেসিডিয়াম ও সম্পাদকমণ্ডলি	৩৬	৫
	কার্যকরী কমিটি	৬৫	৬
জাতীয় পার্টি	জাতীয় স্ট্যান্ডিং কমিটি	৩১	২
	জাতীয় নির্বাহী কমিটি	২০১	৬
জামায়াত	মসলিস-ই-সুরা	১৪১	০
	মসলিশ-ই-আমলা	২৪	০
জাসদ	কার্যনির্বাহী কমিটি	১১২	৪
বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি	কার্যনির্বাহী কমিটি	৫৩	২
বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি	কার্যনির্বাহী কমিটি	৪৫	৪
গণফোরাম	কার্যনির্বাহী কমিটি	১০০	৬

উপর্যুক্ত ছক থেকে বোঝা যায় যে, আমাদের দেশের রাজনীতিতে নারীর ক্ষমতায়ন এখনো একেবারেই তলানিতে।

স্থানীয় সরকারে নারী প্রতিনিধিত্ব

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় উপেক্ষিত নারী ১৯৯৭-এ প্রথম সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচনের সুযোগ পান। এই প্রক্রিয়া শুরু হলে নানা বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়ে হলেও চেয়ারম্যান পদে ২০ জনসহ ১২,৮২৮ জন নারী ইউনিয়ন পরিষদে নির্বাচিত হন। ২০০৩ সালে ২২ জন চেয়ারম্যানসহ ১২,৬৮৪ জন প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। ২০০৪ সালে ১৫০টি পৌরসভার সংরক্ষিত আসনে ৩৭২ জন কমিশনার নির্বাচিত হন। চেয়ারপারসন নির্বাচিত হন ৩ জন।

নির্বাচন	বছর	ইউনিয়ন পরিষদের সংখ্যা	নারী চেয়ারম্যান প্রার্থী	নির্বাচিত নারী চেয়ারম্যান	সদস্য পদে নারী প্রার্থী		সদস্য পদে নির্বাচিত নারী	
					সাধারণ	সংরক্ষিত	সাধারণ	সংরক্ষিত
১ম	১৯৭৩	৪৩৫২	–	১	-	-	-	-
২য়	১৯৭৭	৪৩৫২	–	৪	-	-	-	-

৩য়	১৯৮৪	৪৪০০	–	৬	-	-	-	-
৪র্থ	১৯৮৮	৪,৪৪০	৭৯	১	-	-	-	-
৫ম	১৯৯২	৪,৪৪৩	১১৫	৮	-	-	-	-
৬ষ্ঠ	১৯৯৭	৪, ৪৪৩	–	২৩	-	-	১১০	১২,৮৮২
৭ম	২০০৩	৪,৪৪৩	২৩২	২২	-	৩৯,৪১৯	৭৯	১২,৬৮৪

গত ৪ আগস্ট ২০০৮ তারিখে ৪টি সিটি করপোরেশন ও ৯টি পৌরসভার মধ্যে মাত্র ২টি পৌরসভায় মেয়র পদে নারীপ্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। ২০০২-'০৩ সালে যেখানে সংরক্ষিত আসনে ২৭৯ জন নারী নির্বাচনে প্রার্থী হন, এবার সেখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন মাত্র ১৯৪ জন। অর্থাৎ ২০০৮ সালের নির্বাচনে নারীপ্রার্থীর অংশগ্রহণ ৩৪ শতাংশ কমে গেছে। তবে সাধারণ আসনে নারীপ্রার্থীর হার কিছুটা বেড়েছে।

প্রশাসনে নারী

যদিও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে গত দু'দশকে মেয়েদের অংশগ্রহণ বেড়েছে। তবু সরকারি চাকুরিতে পুরুষের তুলনায় নারীর অংশগ্রহণ এখনো যথেষ্ট কম অর্থাৎ মাত্র ৮ ভাগ। এছাড়া সরকারি কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন বিভাগে নারীর জন্য মাত্র ১৫ শতাংশ কোটা বরাদ্দ আছে, যা এখনো পুরোপুরি পূরণ হয় নি। সিদ্ধান্তগ্রহণ পর্যায়ে নারী অংশগ্রহণের এ হার অত্যন্ত সীমিত।

২০০৮ সালে এসে প্রশাসনে নারীর সংখ্যা কিছুটা বেড়েছে। সরকারি চাকুরিতে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত নারীর সংখ্যা শতকরা ৮ ভাগ। বিচারপতি, সচিব, রাষ্ট্রদূতসহ সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও পুলিশ প্রশাসনেও নারীর অংশগ্রহণ বেড়েছে।

২০০১-'০৫ মেয়াদে চারদলীয় জোট সরকার ক্ষমতায় এসে তিনজন নারীকে রাষ্ট্রদূত, তিনজনকে যুগ্ম-সচিব ও একজনকে হাইকোর্টের বিচারপতি পদে নিয়োগ দেয়। এছাড়া রাষ্ট্রপতি শতকরা ১০ ভাগ নারীকে ঊর্ধ্বতন পদে নিয়োগ দিতে পারবেন মর্মে বিধান রাখা হয়। পিএসসির নিয়োগপ্রক্রিয়ায় ৫৫ ভাগ নেয়া হয় কোটা পদ্ধতি থেকে, আর ৪৫ ভাগ মেধার ভিত্তিতে। এই ৫৫ ভাগের মধ্যে আবার নারীর কোটা ১০ ভাগ। বর্তমানে রাষ্ট্রদূত হিসেবে কর্মরত আছেন ৩ জন মাত্র নারী।[৫] সেনাবাহিনীর ৪৭তম বিএমএ দীর্ঘমেয়াদি কোর্সে সেনা কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ পাওয়া ৩০ জন নারীর মধ্যে কমিশন লাভ করেছেন ২০ জন। ৪৮তম বিএমএ কোর্সে ২১ জন, ৪৯তম কোর্সে ২২ জন এবং ৫০তম কোর্সে ১৩ জন নারী কমিশন লাভ করেন। নৌ ও বিমানবাহিনীর মেডিক্যাল কোরে রয়েছেন বেশ কিছু নারী কর্মকর্তা।[৬]

[৫] সূত্র : সংস্থাপন মন্ত্রণালয়।

[৬] সেনা সদর দপ্তরের গণসংযোগ বিভাগ।

পুলিশ বাহিনীতে নারীসদস্য রয়েছেন ৬ শতাধিক। এ বাহিনীতে ১ জন নারী উপ-মহাপরিদর্শক, ৪ জন অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক এবং ৩৫ জন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আছেন।[৭]

প্রশাসনিক গুরুত্বপূর্ণ পদে নারী

পদ	মোট	পুরুষ	মহিলা	শতকরা হার
সচিব	৪৯	৪৮	০১	২.১
অতিরিক্ত সচিব	৫৫	৪	০১	২.০
যুগ্ম সচিব	২৭৫	২৭১	০৫	১.৫
উপসচিব	৬৫৯	৫৫২	০৭	১.১
সিনিয়র সহকারী সচিব	২২১৪	২০১৪	২০০	৯.০
সহকারী সচিব	১১১৭	৭৫৭	১৬০	১৪.৩
মোট	৪৩৬৯	৩৯৯৬	৩৭৩	৮.৫

জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, প্রশাসনে মোট কর্মচারীর মধ্যে মাত্র ১২% নারী এবং নারী কর্মকর্তা নিয়োগের ব্যাপারে সরকারের উচ্চ পর্যায়ে কোটা থাকা সত্ত্বেও এখনো পর্যন্ত নারীর হার মাত্র ২%। দেশের কোনো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়েই উপাচার্য হিসেবে কোনো নারী কর্মরত নেই। নির্বাচন কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশনসহ অন্য যেকোনো অধিদপ্তর, পরিদপ্তরে কোনো নারী নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে নেই।

বিচার বিভাগে নিয়োজিত নারী

বাংলাদেশের আপিল বিভাগে কোনো নারী বিচারক নেই। সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে কর্মরত ৬৫ জন বিচারপতির মধ্যে নারী আছেন মাত্র ৪ জন। সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, (২০০৮-এর জুলাই পর্যন্ত) দায়িত্বশীল মোট বিচারকের মধ্যে নারী প্রতিনিধিত্বের হার মাত্র ৮.৮৫% এবং মোট আইনজীবীর মধ্যে মাত্র ১৪.৩%।[৮]

কৃষি ও পারিবারিক কাজে অবহেলিত নারী

দেশের শতকরা ৮৫ ভাগ মানুষের পেশা কৃষি। আর এই কৃষি মানেই হলো কৃষক অর্থাৎ পুরুষ। অথচ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থা জরিপ করে বাংলাদেশ সম্পর্কে বলেছে, বাংলাদেশের কৃষির শতকরা ৮০ ভাগ কাজই করেন কৃষক নারী। উৎপাদনের সঙ্গে নারী জড়িত থাকলেও তাকে কাজের স্বীকৃতি দেয়া হয় না। জরিপে বলা হয়েছে, দেশের একজন কৃষকের স্ত্রী উৎপাদন, বিপণন এবং সংরক্ষণের সবকিছুতেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। কিন্তু তাকে কৃষক বলা হয় না। জরিপে

[৭] পুলিশ সপ্তাহ ২০০৮ উপলক্ষে প্রকাশিত পুলিশ সদর দপ্তরের প্রকাশনা

[৮] রেজিস্টারের দপ্তর, হাইকোর্ট

বলা হয়েছে, প্রথমত একজন নারী যে কৃষকের স্ত্রী হিসেবে পরিচিত, তিনিই বীজ সংরক্ষণ করেন। তারপর সেই বীজ থেকে চারা উৎপাদনের আগে যে প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে যেতে হয়, তার প্রায় পুরোটাই সামলান নারী। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বীজতলা তৈরি, চারা উৎপাদন, গাছ লাগানো, নিড়ানো এবং ফসল তোলা প্রায় সব কাজই করতে হয় নারীকে। বিশেষ করে ফসল ঘরে তোলার পর থেকে বাজারজাত করার প্রতিটি কাজই নারীকে অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে করতে হয়। চাষাবাদের সাথে যুক্ত এসব কাজের পাশাপাশি একইভাবে নারী যত্নের সাথে ঘরের কাজও করেন, কিন্তু তার কাজের কোনো স্বীকৃতি তিনি পান না। ঘরের পুরুষ লোকটিকে জিজ্ঞাসা করা হলে, তিনি বলেন, আমি কৃষিকাজ করি। যদি জিজ্ঞেস করা হয় আপনার স্ত্রী কী করেন? উত্তরে তিনি বলেন, কিছু করে না। এভাবেই গ্রামীণ পর্যায় থেকে উচ্চ পর্যায়েও নারীর অধিকাংশ অবদানের কথা কোনোভাবেই মুখে উচ্চারিত হয় না।

গণমাধ্যমে নারী

আমাদের দেশে এখনো গণমাধ্যমে নারীর অংশগ্রহণ ১০ শতাংশও হয় নি। এর মধ্যে গণমাধ্যমের নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে নারীর প্রতিনিধিত্ব নেই বললেই চলে। দেশের একটি প্রথম সারির দৈনিক কাগজে বা ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সর্বোচ্চ পর্যায়ে কোনো নারী প্রতিনিধি নেই। তাছাড়া সংবাদকর্মী হিসেবে ইদানিং নারীর উপস্থিতি দেখা গেলেও তা খুবই সামান্য। নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণ না-থাকায় যে পরিমাণে নারীদের সংবাদ গণমাধ্যমে আসার কথা সে পরিমাণে আসছে না। সেইসঙ্গে নারী বিষয়ক খবর প্রাধান্যও পাচ্ছে না সংবাদ মাধ্যমে। ১৯৯৮ সালে ২০টি জাতীয় দৈনিক, ৩টি ম্যাগাজিন এবং ৫টি সংবাদ সংস্থার ৬৯ জন নারী পেশাজীবীর ওপর একটি জরিপ পরিচালনা করা হয়। জরিপে দেখা যায়, এই সংস্থাগুলোর মোট কর্মীর ৭% নারী, যার মধ্যে প্রতিবেদক বা রিপোর্টার হচ্ছেন মাত্র ২%, আর নারী ফটোসাংবাদিক ছিলেন মাত্র একজন। বলা যায়, গণমাধ্যমে নারী প্রতিবেদকের স্বল্প উপস্থিতি নারীবান্ধব সংবাদ-স্বল্পতার একটি বড়ো কারণ।

সম্পদের অধিকার

বাংলাদেশ একটি গণপ্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র হওয়া সত্ত্বেও দেশের উত্তরাধিকার আইন ধর্মীয় আইন দ্বারা প্রভাবিত। মুসলিম আইনে পিতার সম্পত্তিতে কন্যাসন্তানের অংশ পুত্রসন্তানের অর্ধেক। হিন্দু ধর্মীয় আইনে পিতার সম্পত্তিতে কন্যাসন্তানের কোনো অধিকারই নেই। ফলে সম্পদে (জমি, বনজসম্পদ, জলাশয়) নারীর প্রবেশাধিকার এবং নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত সীমিত। সম্পদে প্রবেশে এই ব্যাপক বাধাদান প্রক্রিয়া নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতাহীনতার জন্ম দিয়েছে ও জিইয়ে রাখছে, যার বহুমুখী বহিঃপ্রকাশ দেখা যায়, নারীর জীবন ও জীবিকায়।

[৯] ইত্তেফাক, ৮ মার্চ ২০০৮

বাংলাদেশের সংবিধানের মৌলিক অধিকার অধ্যায়ে সকল পর্যায়ে ধর্ম-গোষ্ঠী-বর্ণসহ নারী-পুরুষে কোনোরূপ বৈষম্য করা হবে না বলা হয়েছে এবং বলা হয়েছে সংবিধানের এই অধ্যায়ের বিষয়াবলির সাথে দেশে প্রচলিত সকল আইনের যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ ততখানি সংবিধান প্রবর্তনের সময় থেকে বাতিল হয়ে যাবে। প্রচলিত উত্তরাধিকার আইন সংবিধানের এই ঘোষণা অনুযায়ী ১৯৭২ সালেই বাতিল হয়ে গেছে। অর্থাৎ সংবিধান অনুযায়ী বাতিল ওই আইনের দ্বারা এখনো পর্যন্ত নারীদের অধিকারকে হরণ করা হচ্ছে।

অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারী

নারীরা দেশের মোট জনগোষ্ঠীর অর্ধেক এবং দেশ ও সমাজের অবিচ্ছিন্ন অংশ। নারীর যা অর্জন তা দেশের অর্জন, নারীর যা ব্যর্থতা তা দেশেরও ব্যর্থতা। অর্থাৎ নারীকে রাষ্ট্র বা সমাজের মূল অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখবার কোনো অবকাশ নেই। কিন্তু প্রকৃত সত্য এই আদর্শ থেকে অনেক দূরে। যে সমাজ পুরুষতান্ত্রিক একচ্ছত্রতার বলে নির্মিত আইন, শাসন-অনুশাসন ও বিধি প্রয়োগের মাধ্যমে নারীকে মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে, সে সমাজে নারীর যোগ্যতা ও প্রাপ্যতার সঠিক মূল্যায়ন অসম্ভব। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিতে নারীর অবস্থান পুরুষের বহু নিচে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই রয়েছে ব্যাপক জেন্ডার গ্যাপ। জাতীয়ভাবে নারীর অবদানের প্রায় কোনো মূল্যায়নই নেই।

প্রচলিত জাতীয় আয় (জিডিপি) পরিমাপের ক্ষেত্রে পুরুষের উৎপাদনশীলতা যেখানে প্রায় ৯৮ শতাংশ হিসেবে ধরা হয়, সেখানে নারীর উৎপাদনশীলতার মাত্র ৪৭ শতাংশ গণনা করা হয়। গৃহস্থালির কাজ প্রায় এককভাবে নারীরাই সম্পন্ন করেন। কিন্তু কোথাও নারীর গৃহস্থালির কাজকে অর্থনৈতিক কাজ হিসেবে ধরা হয় না।

উৎপাদনশীল পরিমণ্ডলে নারীকে সবসময়ই অনুৎপাদনশীল এবং কেবল ভোগকারী হিসেবে মনে করা হয় বলেই তাদের এই অবস্থা। অথচ নারী সমানভাবে ভোগকারী এবং উৎপাদনকারী। গৃহকর্মের স্বীকৃতিহীনতা জনসংখ্যার অর্ধেক অংশ হিসেবে নারীকে বেকার এবং নিষ্ক্রিয়রূপে চিত্রিত করেছে। এ কারণে দেশের ১০ থেকে ৬৪ বছর বয়স্ক কর্মক্ষম নারী জনসংখ্যার ৯৫ শতাংশকে 'গৃহবধূ' বা 'ঘরনি' নামে আখ্যায়িত করে তাদের রাষ্ট্রের মোট শ্রমশক্তি থেকে বহিস্কৃত করে রাখা হয়েছে।

বাংলাদেশের বসতবাড়িতে পশুসম্পদ (হাঁস-মুরগি ও গরু-ছাগল) উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনায়, বিশেষত গোয়ালঘর নির্মাণ, পরিষ্কার করা, এদের খাওয়ানো, পরিচর্যা, ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ প্রায় ৪৪-৮৫ শতাংশ। অপরদিকে এক্ষেত্রে পুরুষের অংশগ্রহণের হার শূন্য থেকে ৫০ শতাংশ। বসতবাড়িতে 'সবজি বাগান' করার মাধ্যমে পারিবারিক পুষ্টি সমস্যা সমাধানে বাংলাদেশের নারীরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করছেন।

প্রাকৃতিক নিয়মে নারী সন্তান উৎপাদনের কাজে নিয়োজিত। পাশাপাশি সন্তানকে লালনপালনের কাজটিও নারীকেই করতে হচ্ছে। এই দু'টো কাজ করতে গিয়ে নারী তার জীবনের সবচেয়ে সম্ভাবনাময় সময়টাই (১৫-৪০) ব্যয় করে ফেলেন।

বাংলাদেশে শস্য গোলায় তোলা, বীজ সংরক্ষণ করা, খাবারের জন্য শস্য ভাঙানো ও পরিষ্কার করা, পাটকাঠি থেকে আঁশ ছাড়ানো, পশু ও হাঁস-মুরগির যত্ন নেয়া, শাক-সবজি চাষ ইত্যাদি উৎপাদনমূলক কাজের সঙ্গে নারী সরাসরি সম্পৃক্ত। কৃষিকর্মে নারীরা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকলেও অর্থনৈতিকভাবে তাদের কাজের মূল্যায়ন হয় না। বাংলাদেশের নারী তাদের শ্রমসময়ের একটা বড়ো অংশ কৃষিকাজে বিনিয়োগ করে থাকে। বাংলাদেশে মোট গ্রামীণ নারীর ৭৬.৬ শতাংশ কৃষিকাজ করেন।[১০] সময়ের পরিমাপে ও গুরুত্বের দিক থেকে বিবেচনা করলে দেখা যায়, কৃষিক্ষেত্রে নারীর অংশীদারিত্ব কোনোভাবেই পুরুষের চেয়ে কম নয়।

গ্রামীণ নারী কৃষি উৎপাদন ও নানা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে স্বীকৃতিহীনভাবে অবদান রেখে চলেছেন। সারা বছরের প্রায় প্রতিদিনই তারা কোনো-না-কোনো অর্থনৈতিক কর্মে নিয়োজিত। কিন্তু সার্বক্ষণিকভাবে নিয়োজিত হয়েও এখনো তারা কৃষিশ্রমিক হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন নি।

পোশাকশিল্পে নারী

বাংলাদেশে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের প্রধান খাত পোশাকশিল্প, যার পরিমাণ মোট অর্জনের ৭৫ শতাংশ। পোশাকশিল্পে ইতোমধ্যে প্রায় সাড়ে ১৩ লাখ লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে, যার প্রায় ৯০ শতাংশই নারী। তাই প্রকারান্তরে দেশের সিংহভাগ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনও নারীর শ্রমের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু মজুরি ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের বৈষম্য রয়েছে ব্যাপক।

নারীশ্রমিকনির্ভর পোশাকশিল্প কারখানায় নারীরা সাধারণ শ্রমিক হিসেবে কাজ করেন। পোশাকশিল্পে নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে নারী নেই বললেই চলে। প্রোডাকশনের সঙ্গে জড়িত গার্মেন্টস সুপারভাইজার থেকে প্রোডাকশন ম্যানেজার পর্যন্ত সবাই পুরুষ। এর ফলে নারীর সুবিধা-অসুবিধা কিছুই রক্ষিত হয় না।

গার্মেন্টস শিল্পে নানা সমস্যা থাকলেও এ খাতের রপ্তানি আয় ক্রমেই বাড়ছে। প্রাপ্ততথ্যে দেখা গেছে, সদ্যসমাপ্ত অর্থবছরে তৈরি পোশাক রপ্তানি করে বাংলাদেশ ১০ হাজার ৭০১ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করেছে। এর আগের অর্থবছরে এ খাত থেকে বাংলাদেশের আয় হয়েছিল ৯ হাজার ২১১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

---

[১০] চিররঞ্জন সরকার, *নারী ও দারিদ্র্য*, স্টেপস টুওয়ার্ডস ডেভলপমেন্ট, ২০০৭

[১১] ইত্তেফাক, ৩১ আগস্ট ২০০৮

ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পসহ অন্যান্য শিল্পে নারী

বাংলাদেশে চা শিল্পও অন্যতম বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনকারী শিল্প। দেশের ১৫৮টি চা বাগানে শ্রমিক জনগোষ্ঠী রয়েছে মোট পাঁচ লাখ, আর সরাসরি শ্রমিক এক লাখ। এদের মধ্যে বাগান থেকে চা পাতা তোলার কাজটি করেন মূলত নারীরা, যাদের সংখ্যা মোট শ্রমিকের প্রায় ৫২ শতাংশ। খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পেও নারীরা ব্যাপকভাবে নিয়োজিত। চিংড়িশিল্প বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনকারী খাত। এই শিল্পে ঝুঁকিপূর্ণ কাজগুলিতেই নারীরা বেশি সংখ্যায় নিয়োজিত।

কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ ক্রমেই বিস্তৃত হচ্ছে। অথচ এই বিস্তৃত অংশগ্রহণ আজো জাতীয়ভাবে স্বীকৃত হয় নি। কর্মক্ষেত্রে নারীর প্রকৃত অংশগ্রহণকেই কেবল অস্বীকার করা হয় নি, তাকে ন্যায্য মজুরি থেকেও বঞ্চিত করা হয়েছে। কৃষিখাতে একজন পুরুষের মজুরি নারীর চেয়ে অনেক বেশি। অথচ কৃষিশ্রমে নারীর অবদান পুরুষের চাইতে কম নয়। কী কৃষি কী অকৃষি কোনো খাতেই একজন নারী সপ্তাহে গড়ে ১০০ টাকার বেশি উপার্জন করতে পারে না। অথচ দেখা যাচ্ছে, অকৃষি ক্ষেত্রে নিয়োজিত পুরুষদের মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি সপ্তাহে গড়ে ১০০ টাকার বেশি উপার্জন করছে। বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গেছে, চাকুরি জীবনের অন্যান্য সুবিধা, যেমন প্রসূতি ছুটি, অর্জিত ছুটি, চিকিৎসা ছুটি, বাড়িভাড়া, পরিবহণ সুবিধা ইত্যাদি থেকেও পুরুষের তুলনায় নারীকে অনেক বেশি বঞ্চিত করা হয়েছে এবং প্রায় সব কর্মক্ষেত্রেই নারীরা নিচুস্তরের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ কাজগুলোতে নিয়োজিত হতে বাধ্য হয়েছে। অনেক কর্মক্ষেত্রেই নারীদের পুরুষের চাইতে বেশি কর্মঘণ্টা ধরে শ্রম দিতে হয়।[১২] আমাদের দেশে প্রায় ৮০ শতাংশ নারীর মাসিক আয় হলো ১০০০ টাকারও কম। এ পরিমাণ আয় করে এমন পুরুষের হার মাত্র ২০ শতাংশ। নিয়মিত ব্যাংকিং খাতের প্রদত্ত অর্থের মাত্র ১ শতাংশ নারীর হাতে যায়। গড়ে পুরুষদের আয় যত, নারীদের সর্বমোট আয় তার মাত্র ৫৭ শতাংশ। কৃষিখাতে এ আয়ের পরিমাণ ৭১ শতাংশ, উৎপাদন খাতে ৩৫ ও আত্মকর্মসংস্থান খাতে ৩৭ শতাংশ।[১৩]

স্বাস্থ্যখাতে নারী

স্বাস্থ্যখাতে নারীদের প্রতি নিয়মতান্ত্রিক বৈষম্যের প্রমাণ পাওয়া যাবে শিশুমৃত্যু, প্রসূতি মায়ের মৃত্যু, জন্ম প্রত্যাশা ও পারিবারিক ব্যয় সূচকের মধ্যে। সারা পৃথিবীতেই ছেলে নবজাতকের মৃত্যুর হার মেয়ে নবজাতকের তুলনায় বেশি। কিন্তু বাংলাদেশে ১২ মাস পার না হতেই এ চিত্র পালটে যায়। অর্থাৎ ছেলেশিশুদের তুলনায় মেয়েশিশুদের মৃত্যুহার বেড়ে যায়। এর মাধ্যমে প্রমাণিত হয় পরিবারে মেয়ে শিশুটি পুষ্টি ও যত্নের ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার হয়। এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, বাংলাদেশের পরিবারে

---

[১২] ড. নাজনীন আহমেদ, '*অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন ও বাংলাদেশের নারী*' শীর্ষক মূল প্রবন্ধ। ৭ মার্চ ২০০৮-এ অনুষ্ঠিত সেমিনারে উপস্থাপিত।

[১৩] গৃহস্থালি কাজের মূল্যায়নের ভিত্তিতে জাতীয় অর্থনীতিতে নারীর অবদান, ডব্লিউবিবি ট্রাস্ট-হেলথব্রিজ, ঢাকা, মে, ২০০৮।

চিকিৎসা খরচ পুরুষের জন্য মাথাপিছু ২৪ টাকা এবং নারীর জন্য মাথাপিছু ১৮ টাকা। এ দেশের নারীরা পুরুষের চেয়ে ২৯ শতাংশ কম ক্যালরি গ্রহণের সুযোগ পায়। জীবনের সবচেয়ে কর্মঠ সময়টিতে (১৫-৫৯ বৎসর বয়স পর্যন্ত) নারীরা অসুস্থ থাকে বেশি। এর প্রধান কারণ অল্প বয়সে সন্তানের মা হওয়া, বহু সন্তানের জন্মদান, অপুষ্টি এবং অর্থকরী কাজের ত্রিমুখী চাপ। এছাড়া ঘরের বাইরের কাজ, বিশেষ করে, পোশাক শিল্পে কর্মরত নারীদের স্বাস্থ্যের ওপর তার কর্মের নেতিবাচক প্রভাব অতি তীব্র। ৮৫ শতাংশ নারী লৌহ ও আমিষ জাতীয় পুষ্টিহীনতায় ভোগে।

শিক্ষা ও নারী

বাংলাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শতকরা ৩ ভাগ প্রতিষ্ঠান নির্দিষ্ট রয়েছে নারীদের জন্য। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় নারীর প্রবেশাধিকার শতকরা মাত্র ৫ ভাগ। এছাড়া কৃষি ও অন্যান্য পেশাভিত্তিক শিক্ষায় শতকরা ১৪ ভাগ নারী। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে নারীশিক্ষার্থী শতকরা ২৩ জন, মেডিকেল কলেজে শতকরা ২৯ জন এবং প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে শতকরা ৯ জন।

পুরুষের জন্য শিক্ষার খরচ যেখানে ৬৯ টাকা, সেখানে নারীর জন্য মাত্র ৩১ টাকা। শিক্ষাদান পদ্ধতিতে প্রাথমিক শিক্ষায় ৬০ শতাংশ নারীশিক্ষক নিয়োগের জন্য ঘোষিত সরকারি নীতি থাকা সত্ত্বেও এই সংখ্যা এখনো পর্যন্ত মাত্র ৩০ শতাংশ। মাধ্যমিক স্তরে নারীশিক্ষক ১৫ শতাংশ, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নারীশিক্ষক ২ শতাংশ।[১৪] শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা পরিষদেও নারীর কোনো স্থান নেই। এই পরিসংখ্যানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রবেশাধিকার থেকে শুরু করে শিক্ষা ও শিক্ষাদান পদ্ধতিতে নারীর অংশগ্রহণের যে চিত্র পাওয়া যায়, তা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে শিক্ষাক্ষেত্রে নারী-পুরুষের বৈষম্য কত গভীর।

পাঠ্যপুস্তকে নারীর যে চিত্র উপস্থাপিত হয় তা চিরাচরিত ও পুরুষতান্ত্রিকতা সমর্থিত। অর্থাৎ পাঠ্যপুস্তকেও নারী অনেকাংশে নিস্প্রভ।

নারী ও দারিদ্র্য

নারীর ক্ষমতায়ন আসলে সামগ্রিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত। এ দেশের নারী আসলে দু'দিক থেকে নিরন্তর বঞ্চনার শিকার। প্রথমত, নারী নারী হিসেবেই বঞ্চিত; দ্বিতীয়ত, নারী দরিদ্র মানুষ হিসেবে বঞ্চিত। দারিদ্র্য সবার আগে আঘাত করে নারীকে। সংগত কারণে সংখ্যার দিক থেকেও দরিদ্র মানুষের কাতারে নারীরাই বেশি।

এদেশে নারীর ক্ষমতায়নের কথা বলা হলে প্রথমেই ১২ কোটি ৪৩ লাখ দরিদ্র-বিত্তহীন মানুষের তথা ২ কোটি ৬০ লাখ খানার (দেশে মোট খানা ৩ কোটি ১০ লাখ) ৬ কোটি ২০ লাখ নারীর জীবন নিয়ে ভাবতে হবে। এই ৬ কোটি ২০ লাখ দরিদ্র-বিত্তহীন নারী দেশের মোট জনসংখ্যার একক সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ— যারা মোট জনসংখ্যার প্রায় ৪২

[১৪] বিবিএস, ২০০৭

ভাগ।[১৫] এদের অনেকেই ভাসমান মানুষ, যাদের অনেকেই ভিক্ষাবৃত্তির সাথে জড়িত। এদের মধ্যে আছেন বৃদ্ধা-শিশু-কিশোরী ও যুবতী। এদের অনেকেই আছেন হাওর-বাঁওড় ও চরে। অনানুষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত নারীদের একটা বড়ো অংশ আদিবাসী, নিম্নবর্গীয় দলিত সম্প্রদায়ের প্রান্তিক মানুষ। সুতরাং এদেশে নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নসহ মানুষের ক্ষমতায়নের যত রূপ থাকতে পারে, তা দূর করতে হলে অবশ্যই সর্বপ্রথম উল্লিখিত ৬ কোটি ২০ লাখ দরিদ্র-বিত্তহীন নারীর কথা ভাবতে হবে।

নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন তার সামগ্রিক ক্ষমতায়নের প্রধান পূর্বশর্ত হতে পারে, তবে তা একমাত্র নয়। অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন অর্জন ও তা টিকিয়ে রাখা সম্ভব হবে না, যদি না ক্ষমতায়নের অন্য উৎসগুলো একই সাথে কাজ করে। যার মধ্যে আছে রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন, সামাজিক সুবিধাদি প্রাপ্তি থেকে উদ্ভূত ক্ষমতায়ন (শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি), স্বচ্ছতা-উদ্ভূত ক্ষমতায়ন এবং ব্যক্তিগত সুরক্ষা-সংশ্লিষ্ট ক্ষমতায়ন। আর এসব ক্ষমতায়ন-উদ্দিষ্ট পরিকল্পনায় অবশ্যই প্রধান অগ্রাধিকার দিতে হবে উল্লিখিত ৬ কোটি ২০ লাখ দরিদ্র-বিত্তহীন-প্রান্তিক নারীকে।[১৬]

জাতীয় পরিকল্পনায় ওই ৬ কোটি ২০ লাখ দরিদ্র-বিত্তহীন-প্রান্তিক নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে, তা রাজনৈতিক দলের মেনিফেস্টোতে উল্লেখ থাকতে হবে।

নারী ও জাতীয় বাজেট

একটি দেশের জাতীয় বাজেট সে দেশের জাতীয় উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ দেশের জাতীয় নীতির সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য কোন খাতে দেশটির কত আয় হবে, কোন খাতে কত ব্যয় হবে, কোন খাতকে অগ্রাধিকার দিতে হবে, সে দেশের কোন জনগোষ্ঠীকে অগ্রাধিকার দিতে হবে ইত্যাদি বিষয় সে দেশের জাতীয় বাজেটে প্রতিফলিত হয়। বাংলাদেশের জাতীয় বাজেটে ২০০১-'০২ অর্থবছরে নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের জন্য বরাদ্দ ছিল ৯০ কোটি টাকা (রাজস্ব ব্যয় ২২ কোটি ও উন্নয়ন ব্যয় ছিল ৬৮ কোটি টাকা), যা মোট বাজেটের ০.২২ শতাংশ। ২০০২-'০৩ অর্থবছরে বাজেট ছিল ১২৩ কোটি ৮ লাখ টাকা (রাজস্ব ব্যয় ২৭ কোটি ও উন্নয়ন ব্যয় ছিল ৯৬ কোটি টাকা), যা মোট বাজেটের ০.২৭ শতাংশ এবং ২০০৩-'০৪ অর্থবছরে এ বরাদ্দ হচ্ছে ২৩৭ কোটি টাকা, যা মোট বাজেটের মাত্র ০.৩৬ শতাংশ। ২০০৫-'০৬ অর্থবছরে নারীকে লক্ষ্যভূত করে গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পে মোট রাজস্ব বাজেটের মাত্র ৪ শতাংশ রাখা হয়। ২০০৭-'০৮ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ

---

[১৫]Barkat A, S Halim, A Podder, A Osman, M Badiuzzaman, 2008. Development as Conscientization: The Case of Nijera kori in Bangladesh, Pathak Shamabesh: Dhaka

[১৬] **আবুল বারাকাত,** নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন যা ভাবতে হবে, **দৈনিক ইত্তেফাক, ১১ সেপ্টেম্বর ২০০৮**।

বরাদ্দ মিলিয়ে নারী-পুরুষ বৈষম্য দূরীকরণ তথা সম্পদ ও সুযোগ সমতাকরণের ব্যয় ধরা হয়েছে মোট বাজেটের ২৪ ভাগ।

বাজেটে নারীর জন্য বরাদ্দ বাড়লেও তা এখনো পর্যাপ্ত নয়। জাতীয় বাজেটে নারীকে এখনো পর্যন্ত বিত্তহীন, দুস্থ ও হতদরিদ্র হিসেবেই বিবেচনা করা হচ্ছে। ফলে শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ বিভিন্ন মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত নারী এখনো দারিদ্র্যের তলানিতেই পড়ে থাকছে। তাই নারী ও পুরুষের মধ্যে বৈষম্য দূর করতে এবং নারীর আর্থ-সামাজিক ক্ষমতায়নের জন্য জাতীয় বাজেটে নারীর জন্য বরাদ্দ বৃদ্ধি বা জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রণয়ন ব্যাপারটি অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে।

আদিবাসী নারী

আদিবাসী নারীকে যেসব বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হয় তার কতকটা আদিবাসী হওয়ার কারণে আর কতকটা নারী হওয়ার কারণে। যেখানে সবধরনের সমাজে নারী রয়েছেন
অধস্তন অবস্থানে, সেখানে আদিবাসী নারী রয়েছেন আরো অধস্তন ভূমিকায়। আদিবাসী নারীদের সমাজে চলাফেরায় বাধা না-থাকলেও পারিবারিক, সামাজিক মর্যাদার দিক থেকে সমতলের নারীদের মতোই প্রতিপদে তারা বাধাগ্রস্ত হচ্ছেন। আদিবাসী সমাজেও নারী-পুরুষ সম্পর্কে অসমতা রয়েছে। সমতলের আদিবাসী সম্প্রদায় খাসিয়া ও গারোদের সমাজব্যবস্থা খানিকটা মাতৃসূত্রীয় হলেও এদেশের বাকি সকল আদিবাসী সম্প্রদায়ের সমাজই পুরোপুরি পুরুষতান্ত্রিক। যেহেতু সমাজ/পরিবার পুরুষতান্ত্রিক, সেহেতু নারীরা পুরুষের অধীন। সামাজিক কর্মকাণ্ডে নারীদের অংশগ্রহণ খুবই কম। পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রতিটি মৌজায় (কয়েকটা গ্রাম মিলে) একজন হেডম্যান থাকেন। কিন্তু তিন পার্বত্য জেলায় গড়ে প্রায় ৩০০-এর উপরে মৌজায় নারী হেডম্যান রয়েছেন মাত্র ৪ জন এবং তাঁরা স্বামীর মৃত্যুর পর স্বামীর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন মাত্র। পার্বত্য শান্তিচুক্তিতে উল্লিখিত আছে যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদে ২২ জন প্রতিনিধির মধ্যে তিনজন নারী থাকবেন। অন্যদিকে পার্বত্য জেলা পরিষদে তিন পার্বত্য জেলায় ৩ জন করে মোট ৯টি আসন নারীদের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে জেলা পরিষদ নারী আসন শূন্য। জেলা কাউন্সিলের প্রতিনিধিরা জাতীয় কাউন্সিলের প্রতিনিধি নির্বাচন করেন, কিন্তু জেলা কাউন্সিলে কোনো নারী প্রতিনিধিত্বই নেই।[১৭]

আদিবাসী নারীরা অর্থনৈতিকভাবে মোটেও স্বাবলম্বী নয় অথচ বীজ সংরক্ষণ, বীজ বপন, ধান কাটা, জুমচাষ, জুম ক্ষেত প্রস্তুত করা থেকে শুরু করে ভূমিসংশ্লিষ্ট প্রতিটি কাজের সঙ্গেই নারীরা নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত। ইউএনডিপি'র এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, কৃষিতে আদিবাসী নারীদের অংশগ্রহণ প্রায় ৯০ শতাংশ। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, এই ভূমির ওপর আদিবাসী নারীদের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মালিকানা নেই।

[১৭] কেউক্রুডং, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের মুখপত্র, ৯ আগস্ট ২০০৮

পরিবারে নারীকে একাধারে স্ত্রী, মাতা, অর্থ উপার্জনকারী হিসেবে ভূমিকা পালন করতে হয়। সন্তান জন্মদান, সন্তানের পরিচর্যা থেকে শুরু করে গৃহস্থালি কাজকর্ম, কৃষি/জুমচাষ, কাপড় বোনা সব কাজই নারীকে করতে হয়। কিন্তু দেখা যায়, সকল কাজ করা এবং বাজারে অভিগম্যতা থাকার পরেও পুরুষতান্ত্রিকতার বেড়াজাল থেকে তারা বের হয়ে আসতে পারে নি। পরিবারের সকল সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় পুরুষের মতামতকেই প্রাধান্য দেয়া হয়। আমাদের দেশে নারী-পুরুষের মধ্যে মজুরি বৈষম্য প্রকট। আদিবাসীদের ক্ষেত্রে এই সমস্যা আরো মারাত্মক। একই ধরনের পরিশ্রম করার পর নারীরা পায় পুরুষের চেয়ে অর্ধেক মজুরি। যেহেতু শিক্ষাক্ষেত্রে আদিবাসী জনগোষ্ঠী পিছিয়ে আছে, তাই চাকুরিতে নিয়োজিতরা এখনো সংখ্যায় খুবই নগণ্য। তারপরও বর্তমানে অফিস আদালতে আদিবাসীদের উপস্থিতি যতটাই দেখা যায়, সেখানে নারী একেবারেই হাতে গোনা। এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, সম্প্রতি আদিবাসী নারীদের জন্য নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে চাকুরির চাহিদা তৈরি হয়েছে। যেমন বিউটিগার্ল হিসেবে বিউটি পার্লার, সেবিকা হিসেবে হাসপাতাল ও ক্লিনিক এবং রিসেপসনিস্ট হিসেবে বেসরকারি অফিস-আদালত প্রভৃতিতে। কিন্তু এসব কাজে নারীকে খুবই কম পারিশ্রমিক দেয়া হয়।[১৮] যার ফলে আদিবাসী নারীরা একদিকে যেমন মজুরি বৈষম্যের শিকার হচ্ছে, অন্যদিকে তারা হারাচ্ছে সামাজিক নিরাপত্তা। জাতীয় উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় আদিবাসী নারীদের সম্পৃক্ত করার জন্য প্রয়োজন সঠিক পরিকল্পনা।

গারো ও খাসিয়া সম্প্রদায় ছাড়া অন্য আদিবাসীদের মধ্যে কার্যকর পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারীদের সম্পত্তিতে কোনো অধিকার নেই। পিতা ইচ্ছা করলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে কন্যাকে সম্পত্তির অংশ দিতে পারেন আবার নাও পারেন। যেমন চাকমা সমাজে পিতার সম্পত্তিতে কন্যার কোনো অধিকার নেই, তবে পিতা ইচ্ছা করলে কন্যাকে সম্পত্তি দান ও উইল করে দিতে পারেন। তবে সম্পত্তি বিক্রি করতে হলে স্বামীর অনুমতি গ্রহণ অপরিহার্য। নিয়ম অনুযায়ী বিয়ের পর মেয়েদের বাপের বাড়িতে কোনো অধিকার থাকে না। স্বামীর মৃত্যুর পর কিছু অংশ পাওয়ার কথা থাকলেও পুনরায় বিয়ে করলে তারা সে অধিকারও হারায়। কোনো ব্যক্তি যদি মেয়ে সন্তানকে সম্পত্তির অংশ লিখে দিয়ে না-যায় তাহলে ওই ব্যক্তির মৃত্যুর পর মেয়ে সন্তান সম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়।

গারো ও খাসিয়া পরিবারে মাতাই হলেন মুখ্য বা প্রধান ব্যক্তি। সন্তানেরা মায়ের পরিচয়ে পরিচিত হন এবং মায়ের উপাধি গ্রহণ করেন। পরিবারের সর্বকনিষ্ঠ কন্যা পরিবারের সমুদয় সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভ করে থাকেন। কিন্তু পরিবারে যেহেতু পিতা ব্যবস্থাপকের ভূমিকা পালন করেন, তাই নারী সম্পত্তির মালিক হলেও কার্যত সম্পত্তি ভোগে কোনো ভূমিকা রাখতে পারেন না। অন্যান্য সম্প্রদায়ের পরিবারে পিতার ভূমিকাই প্রধান। পিতার সূত্র ধরে বংশ বা গোত্র নির্ণয় করা হয়। পিতার পর পুত্রই হয় সমুদয় সম্পত্তির মালিক।

---

[১৮] কেউক্রডং, ৯ আগস্ট ২০০৮

প্রতিবন্ধী নারী

বাংলাদেশের প্রতিবন্ধী নারীরা একটি বৈরী পরিবেশে বাস করছে, তারা অসহযোগিতা মোকাবেলা করছে, খারাপ ব্যবহার পাচ্ছে, অবহেলার শিকার হচ্ছে। সম্মুখীন হচ্ছে পরিবার, সমাজ ও সরকারি পর্যায়ে নানারকম বিরূপ পরিস্থিতির। এসব নারী কেবল সামাজিক-রাজনৈতিক অধিকার থেকেই বঞ্চিত হচ্ছে না, বরং বঞ্চিত হচ্ছে নানারকম মৌলিক মানবাধিকার থেকেও। প্রায়ই দেখা যায়, তারা কর্মসংস্থান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবা থেকেও বঞ্চিত। জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির ৭.৪-এ প্রতিবন্ধী নারীকে 'নিষ্ক্রিয় সেবা গ্রহীতা' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। 'সহায়ক সেবা প্রদান' ছাড়া আর কিছুরই নির্দেশনা নেই এই নীতিতে। জাতীয় অবস্থান বলতে গেলে এরকমই। প্রতিবন্ধী বিষয়ক জাতীয় নীতিমালা হয়েছে ১৯৯৫ সালে। দুঃখজনক ব্যাপার হলো, এই নীতিমালায় নারীর প্রসঙ্গ নেই কোথাও। প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন ২০০১-এ প্রতিবন্ধী নারীকে আলাদা কোনো গোষ্ঠী হিসেবে বিবেচনায় নেয়া হয় নি। প্রতিবন্ধী নারীদের অ্যাজেন্ডাগুলো নারী আন্দোলনের মূলস্রোতের প্রধান অ্যাজেন্ডাগুলোর মধ্যে নেই। এরকম সুবিধাবঞ্চিত হওয়ার কারণে প্রতিবন্ধী নারী দরিদ্র নারীদের থেকেও দরিদ্রতম অবস্থানে রয়েছে।

অন্যান্য প্রান্তিক নারীগোষ্ঠী

কিছু অনগ্রসর গোষ্ঠী রয়েছে, যারা সামাজিক অন্যায়ের শিকার এবং তাদেরকে প্রান্তিকতার শেষ বিন্দুতে ঠেলে দেয়া হয়। তাদের সংস্পর্শ অভিশপ্ত বলে গণ্য করা হয়। তারা জীবনের এই কঠোর নির্মম বাস্তবতা থেকে বেরিয়ে আসার সুযোগ পায় না। এই গোষ্ঠীগুলো সমাজবিচ্ছিন্নভাবে বাস করছে এবং তাদের কাছে কোনো সামাজিক-রাষ্ট্রিক সেবা পৌঁছে না অথবা পৌঁছলেও তা যথেষ্টই অপ্রতুল। এদের মধ্যে রয়েছে ধাঙড়, বেদে, চা শ্রমিক, ঋষি সম্প্রদায়, যৌনকর্মী, উদ্বাস্তু নারী ইত্যাদি। তারা শিক্ষা, স্বাস্থ্য সেবাসহ মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত।

নারীর প্রতি সহিংসতা ও নিরাপত্তাহীনতা

পরিবারের ভেতরে ও বাইরে উভয় জায়গাতেই নারীরা সহিংসতার শিকার হচ্ছে। বাংলাদেশের সংবিধানে নারীর সমানাধিকারের কথা বলা হলেও প্রচলিত আইনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর প্রতি বৈষম্য রয়েই গেছে। বিরাজমান এই বৈষম্য ও পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে অসংখ্য নারী যৌতুক,

প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ২০০২-২০০৭ সাল পর্যন্ত আমাদের দেশে ৪২১৯ জন ধর্ষণ, ১৮৪৪ জন গণধর্ষণ, ১২৭৫ জন এসিড সন্ত্রাস, ৬১৬১ জন অপহরণ, ১২৫৭ জন যৌতুকের কারণে হত্যা, ৪৪৩৫ জন শারীরিক নির্যাতন এবং ৩৪৫ জন নারী শিকার হন ফতোয়ার। পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেশের প্রায় ৪৭ ভাগ নারী গৃহে স্বামীর দ্বারা নির্যাতিত হন প্রতিদিনই। বাকী ৫৩ শতাংশ নির্যাতিত হন মাঝে মধ্যে। ইউএনএফপিএ কর্তৃক প্রকাশিত তথ্যানুযায়ী, বাংলাদেশে শতকরা ৬৮ ভাগ নারী তাদের নির্যাতনের কথা প্রকাশ করেন না।

(ইত্তেফাক, ২৭ নভেম্বর ২০০৮)

শারীরিক নির্যাতন, পাচার, অ্যাসিড নিক্ষেপ, ধর্ষণসহ নানাভাবে শারীরিক-মানসিক নির্যাতনের শিকার হচ্ছে প্রতিনিয়ত।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে নারী নির্যাতন প্রতিহিংসাপরায়ণ দুই পক্ষের মধ্যকার সহিংস রাজনীতি চর্চার মাধ্যমে পরিণত হয়েছে। ন্যায়বিচার না-পেয়ে নির্যাতিত নারীদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতাও বেড়েছে। নারী নির্যাতনের অসংখ্য মামলা বিচার বিভাগের সংবেদনশীলতার অভাব, আইনের পদ্ধতিগত জটিলতা এবং প্রভাবশালী ও সন্ত্রাসীদের দৌরাত্ম্যের কারণে দীর্ঘদিন ধরে অমীমাংসিত থেকে যাচ্ছে অথবা অগ্রহণযোগ্যভাবে মীমাংসিত হচ্ছে। এছাড়া সাম্প্রতিক সময়ে রাজপথে যেকোনো আন্দোলনে নারী রাজনৈতিক কর্মীদের ওপর চালানো হচ্ছে পুলিশি নগ্ন আক্রমণ, যা নারীর ওপর রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসেরই বহিঃপ্রকাশ। এ পরিস্থিতি জনমনে জন্ম দিচ্ছে নানা প্রশ্নের। বিচার চেয়েও ন্যায়বিচার প্রাপ্তি থেকে এই বঞ্চনা শুধু নারীকেই নয়, সমগ্র সমাজজীবনকে ঠেলে দিচ্ছে চরম অনিশ্চয়তার দিকে। এই অনিশ্চিত অবস্থা ও নিরাপত্তাহীনতা নারীকে ক্রমশ অসহায় করে তুলছে।

ফতোয়া ও নারী

দীর্ঘকাল ধরে এক শ্রেণির উগ্র সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী নানা অজুহাতে নারীদের, বিশেষত গ্রাম-বাংলার দরিদ্র নারীদের বিরুদ্ধে ফতোয়া জারি করে তাদের বর্বরোচিত পন্থায় লাঞ্ছিত ও হত্যা করে চলেছে। গত এক দশকে কেবল পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী দেশে দুই শতাধিক নারীকে এই বর্বর ফতোয়াবাজদের হাতে চরম নির্যাতন ও লাঞ্ছনা সয়ে জীবন দিতে হয়েছে। সিলেটে পাথর ছুড়ে মারা নূরজাহান এবং ফরিদপুর জেলার মধুপুরের পুড়িয়ে মারা নূরজাহান তাদের অন্যতম।

৯ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে নারীনেতৃত্ব উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পাওয়ায় আমরা যখন আশান্বিত হয়েছি, ঠিক সে মুহূর্তেও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মধ্যযুগীয় কায়দায় নারীর ওপর দোররা মারা চলছে। উদাহরণ হিসেবে সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জের ধুচিল মেহমানশাহী গ্রামের ঘটনার উল্লেখ করা যায়। সেখানে মামলা করার অপরাধে ওই গ্রামের মাতব্বর ধর্ষিতাকে ১০০ ঘা বেত্রাঘাত ও ১০ হাজার টাকা জরিমানা করে। বিস্ময়কর যে, এ বিষয়ে প্রশাসন নীরব ভূমিকাই পালন করেছে।

নারীসমাজ, সংবাদপত্র, মানবাধিকার সংগঠন, উন্নয়ন সংগঠনসমূহ এবং সুশীলসমাজ এই বর্বরতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও নিন্দা জানিয়ে এসেছে বারবার। কিন্তু তাতে এ যাবৎ তেমন কোনো ফল হয় নি। সমাজের এসব দুর্বৃত্ত, নারী নির্যাতনকারী চক্র দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির অভাবে আজো ধরাছোঁয়ার বাইরেই থেকে গেছে। ফতোয়াবাজরা সবসময়ই নিজেদের আইনের ঊর্ধ্বে ভেবে এসেছে। আইন, আদালত, রাষ্ট্র, সংবিধান কোনোকিছুরই তারা তোয়াক্কা করে না।[১৯] কোনো সভ্যসমাজ এ অবস্থা মেনে নিতে

[১৯] আব্দুল কাইয়ুম, নারীর সমানাধিকার ছাড়া সভ্য সমাজ হয় না, প্রথম আলো ৩০ এপ্রিল, ২০০৮

পারে না। এই পরিপ্রেক্ষিতে গত ২০০১ সালের ১ জানুয়ারি হাইকোর্টের দুই বিচারক বিচারপতি গোলাম রাব্বানী ও বিচারপতি নাজমুন আরা সুলতানাকে নিয়ে গঠিত বিশেষ বেঞ্চ সব ধরনের ফতোয়াবাজিকে বেআইনি ও সংবিধান বিরোধী বলে ঐতিহাসিক রায় দেয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, এই রায় পরবর্তী আরেক আদেশে স্থগিত করা হয়। হাইকোর্টের প্রথমোক্ত রায়টি কার্যকর করার যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ না-করায় ফতোয়াবাজ ও মৌলবাদী দুর্বৃত্তরা একের পর এক ফতোয়া দিয়ে নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটিয়েই যাচ্ছে।

বাংলাদেশের সংবিধান এবং নারীর রাজনৈতিক অধিকার

দেশের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী দলিল গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে নারীসমাজের পূর্ণ মানবাধিকার সংরক্ষিত আছে। প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক সদিচ্ছা, প্রতিষ্ঠানসমূহের পুরুষতান্ত্রিক আচরণ ও মনোভঙ্গির কারণে এসব নীতির বাস্তবায়ন আজ অবধি অসম্পূর্ণই রয়ে গেছে।

এক নজরে দেখে নেয়া যাক নারীসমাজের প্রতি সংবিধানের অঙ্গীকারসমূহ—

রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতি অধ্যায়

- সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করিতে রাষ্ট্র সচেষ্ট হইবেন। (১৯-এর ১ম উপধারা)

মৌলিক অধিকার অধ্যায়

- সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী। (২৭ ধারা)
- কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারীপুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না। (২৮ এর ১ম উপধারা)
- রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষের সমান অধিকার লাভ করিবেন। (২৮ এর ২য় উপধারা)
- কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারীপুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে জনসাধারণের কোন বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের কিংবা কোনো শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে কোন নাগরিককে কোনরূপ অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা, বাধা বা শর্তের অধীন করা যাইবে না। (২৮ এর ৩য় উপধারা)
- নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান-প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না। (২৮ এর ৪র্থ উপধারা)
- প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ-লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকিবে। (২৯ এর ১ম উপধারা)

- কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারীপুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিক প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ-লাভের অযোগ্য হইবেন না কিংবা সেই ক্ষেত্রে তাঁহার প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা যাইবে না (২৯ এর ২য় উপধারা)

  এই অনুচ্ছেদের কোনো কিছুই—

  (ক) নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশ যাহাতে প্রজাতন্ত্রের কর্মে উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব লাভ করিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে তাঁহাদের অনুকূলে বিধান-প্রণয়ন করা হইতে,
  (খ) কোন ধর্মীয় বা উপ-সম্প্রদায়গত প্রতিষ্ঠানে উক্ত ধর্মাবলম্বী বা উপ-সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের জন্য নিয়োগ-সংরক্ষণের বিধান-সংবলিত যে কোন আইন কার্যকর করা হইতে,
  (গ) যে শ্রেণীর কর্মের বিশেষ প্রকৃতির জন্য তাহা নারী বা পুরুষের পক্ষে অনুপযোগী বিবেচিত হয়, সেইরূপ যে কোন শ্রেণীর নিয়োগ বা পদ যথাক্রমে পুরুষ বা নারীর জন্য সংরক্ষণ করা হইতে রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না (২৯ এর ৩য় উপধারা)।[২০]

এসব ধারার আলোকে দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশের সংবিধানে সকল প্রকার রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারী বা পুরুষের সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে। সুতরাং নারী-পুরুষ সমতা প্রতিষ্ঠার জন্য উপযুক্ত কর্মসূচি ও কর্মকৌশল গ্রহণ আমাদের সাংবিধানিক বাধ্যকতা। সংবিধানে বর্ণিত এ ধারাসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা তাই রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য অবশ্যপালনীয় কর্তব্যকর্ম। এ ব্যাপারে রাজনৈতিক দলের ইশতেহারে স্পষ্ট অঙ্গীকার থাকা প্রয়োজন।

আইন ও নারী

বাংলাদেশের সংবিধান জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীর সমঅধিকারকে স্পষ্টভাবে অনুমোদন করেছে। এছাড়াও এ সংবিধানে নারীসহ অন্যান্য পশ্চাৎপদ জাতিসত্তার অগ্রগতি সাধনের জন্য বিশেষ বিধানের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। সংবিধানের ২৬তম অনুচ্ছেদ অনুসারে প্রচলিত কোনো আইন বা নীতি মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী হলে তা এমনিতেই বাতিল হয়ে যাবে। কিন্তু বাস্তব অবস্থা ভিন্ন। নারীর প্রতি বৈষম্যপূর্ণ ও সংবিধানের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ আইনগুলো এখানে এখনো বর্তমান। অন্যদিকে ফৌজদারি-দেওয়ানি আইনের ক্ষেত্রে তুলনামূলক কম বৈষম্য থাকলেও ব্যক্তিগত আইনসমূহ নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক। ধর্মভিত্তিক ব্যক্তিগত আইনের প্রয়োগ শুধু নারী-পুরুষের মাঝেই বৈষম্য জিইয়ে রাখছে না, উপরন্তু নারীতে-নারীতেও বৈষম্য তৈরি করছে।

[২০] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, আইন মন্ত্রণালয়, ২০০৫

- ১৯৬১-'র মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ এবং ১৯৮৬-'র সংশোধন— যা শিশুর রক্ষণাবেক্ষণ এবং অভিভাবকত্ব, বিবাহ এবং বিবাহ বিচ্ছেদ, সম্পত্তির উত্তরাধিকার ইত্যাদি শর্তের মতো ব্যক্তিগত বিষয়গুলো নিয়ন্ত্রণ করছে এবং যার মাধ্যমে স্বামীর দ্বিতীয় বিয়ের আগে স্ত্রীর নিকট থেকে অনুমতি নেয়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এক্ষেত্রে একজন নারীর কোনো অবস্থাতেই দ্বিতীয় বিবাহ করার অনুমতি নেই, যদি না তার স্বামী মারা যায় অথবা বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে। এছাড়া পারিবারিক আদালত আইনের বৃহদাংশ বাংলাদেশের মুসলমানদের ওপরই শুধু কার্যকর। অথচ এ দেশে মুসলিম, হিন্দু, খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক বসবাস করে। অন্যদিকে পারিবারিক আদালতের আওতাধীন যে পাঁচটি বিষয় রয়েছে (১. বিবাহ বিচ্ছেদ, ২. দাম্পত্যাধিকার পুনরুদ্ধার, ৩. দেনমোহর, ৪. খোরপোষ ও ৫. শিশু সন্তানের অভিভাবকত্ব ও তত্ত্বাবধান), তার প্রথমটি ও তৃতীয়টি বাংলাদেশের হিন্দুসমাজের স্বামী-স্ত্রীর ওপর প্রযোজ্য হতে পারে না। কাজেই বিভিন্ন সম্প্রদায় যার যার ব্যক্তিগত আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। হিন্দু ব্যক্তিগত আইনে হিন্দু বিবাহ কোনো অবস্থায়ই বিচ্ছেদযোগ্য নয় এবং হিন্দু স্ত্রী দেনমোহর পাওয়ার অধিকারী নয়। তাই এসব বিষয় নিয়ে তারা পারিবারিক আদালতের শরণাপন্ন হতে পারে না।

- ১৯৮০ সালের যৌতুক বিরোধী আইন এবং ১৯৮৬ সালের সংশোধিত আইনে যৌতুক দেয়া এবং নেয়া শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে এবং এজন্য অর্থদণ্ড এবং যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দুই-ই হতে পারে। এই আইন থাকা সত্ত্বেও এদেশে নারী নির্যাতনের প্রধান কারণটি যৌতুক।

- ১৯৮৪ সালের বাল্যবিবাহ রোধকরণ অধ্যাদেশ নারী ও পুরুষ উভয়ের বিবাহের আইনগত বয়স স্থির করে। এই অধ্যাদেশ অনুযায়ী ওই বয়সের পূর্বে কারো বিয়ের ব্যবস্থা করা হলে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবে। কিন্তু এই আইনের ব্যবহার অত্যন্ত সীমিত।

- অ্যাসিড নিয়ন্ত্রণ আইন ২০০২ প্রণয়ন : অ্যাসিড নিক্ষেপের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তি র বিধান এবং অ্যাসিড আমদানি, সরবরাহ, বিক্রি ও ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ।

উত্তরাধিকার আইন ধর্ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বলে ছেলে-মেয়েতে বৈষম্য তো রয়েছেই, পাশাপাশি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নারীতে-নারীতেও আইনটি পার্থক্য ও বৈষম্যসূচক।[২১] উপরোল্লিখিত আইনসমূহের সংস্কার ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নতুন আইন প্রণয়নের ব্যাপারে রাজনৈতিক দলগুলোর ইশতেহারে সুনির্দিষ্ট অঙ্গীকার থাকা প্রয়োজন।

[২১] সালমা আলী, কালক্ষেপণ নয়, চাই সময়ের সদ্ব্যবহার, সমকাল, ৫ মে ২০০৮

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার

নারী-পুরুষ সমতা প্রতিষ্ঠা বা লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণে বাংলাদেশ মানবাধিকারসহ নারীদের সমঅধিকার সম্পর্কিত বিভিন্ন কনভেনশন (convention) এবং মানবাধিকার সনদে স্বাক্ষর করেছে। নিম্নে এসব বিষয়ে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হলো :

সিডও (Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women— CEDAW)

সিডও হচ্ছে নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্তর্জাতিক চুক্তি বা সনদ। ১৯৭৯ সালের ১৮ ডিসেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে 'নারীর প্রতি সকল ধরনের বৈষম্য বিলোপ সনদ' সংক্ষেপে সিডও সনদ গৃহীত হয়। ১৯৮১ সালের ৩ সেপ্টেম্বর থেকে এই সনদ কর্যকর করা শুরু হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার এর ধারা ২ ও ধারা ১৩ (ক), ধারা ১৬-১ (গ) এবং ধারা ১৬-১ (চ) সংরক্ষণসাপেক্ষে পরিগ্রহণ করে ১৯৮৪ সালের ৬ নভেম্বর। ১৯৯৭ সালে বাংলাদেশ সরকার সিডও সনদের ধারা ১৩ (ক) ও ১৬-১ (চ) থেকে সংরক্ষণ প্রত্যাহার করে এবং ধারা দুইটি অনুমোদন করে। কিন্তু সিডও সনদের প্রাণ হিসেবে গণ্য ধারা ২ এবং অন্যতম একটি মূলধারা ১৬-১ (গ) থেকে বাংলাদেশ সরকার এখনো সংরক্ষণ প্রত্যাহার করে নি। এটি নারী উন্নয়নে একটি বড়ো বাধা। উল্লেখ্য, সিডও'র ২ নম্বর ধারায় নারীর প্রতি বৈষম্য বিলোপে রাষ্ট্রকে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করতে এবং বৈষম্যমূলক আইন থাকলে তা বাতিল করতে বলা হয়েছে। আর ১৬ (১-গ) ধারায় বিয়ে ও বিয়ে বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের একই অধিকার ও দায়দায়িত্ব নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে।

আইনগুলো ইসলামি শরিয়া আইনের পরিপন্থী— এই অজুহাত দেখিয়ে সরকার উল্লিখিত ধারা দুইটি থেকে সংরক্ষণ বা আপত্তি এখনো পর্যন্ত তুলে নেয় নি। কিন্তু আমাদের দেশ তো শরিয়া আইন দ্বারা পরিচালিত নয়। তাছাড়া ইয়েমেন, ইন্দোনেশিয়া, মরক্কো, তিউনিসিয়ার মতো ইসলামি আইন মেনে চলা দেশগুলোতে সিডও সনদের কোনো ধারা সংরক্ষণ করা হয় নি। তাহলে আমাদের দেশ সংরক্ষণ তুলে নিতে পারবে না কেন ?

সিডও সনদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে ধারা সংরক্ষণ পরস্পরবিরোধী। নয়টি আন্ত র্জাতিক মানবাধিকার সংক্রান্ত সনদের মধ্যে অন্যতম সিডও। শিশু অধিকার সনদের পর এই সনদটি সর্বাধিক দেশ কর্তৃক অনুমোদনপ্রাপ্ত সনদ। ১৮৫টি দেশ সিডও সনদ অনুমোদন করেছে।

বাংলাদেশ সরকারের এই ধারা দুটি সংরক্ষণ যুক্তিসংগত নয়। সংবিধানের সঙ্গেও ধারা দুটির সামঞ্জস্য আছে। বাংলাদেশের সংবিধানে ধারা ১০, ১৯, ২৭, ২৮ ও ২৯-এ জীবনের সব ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সব নাগরিকের সমান অধিকার নিশ্চিত করা

হয়েছে। তাই শরিয়া আইনের দোহাই দিয়ে দুটি ধারা সংরক্ষণ নারী-পুরুষের সমতার সাংবিধানিক নীতিলঙ্ঘন করার শামিল ও অযৌক্তিক।

বাংলাদেশের প্রায় সব আইনই প্রণীত হয়েছে ইউরোপীয় সিভিল আইনের আদলে। শুধু নারী অধিকার খর্বকারী ব্যক্তিগত বা পারিবারিক আইন হচ্ছে ধর্মীয় আইন নির্ভর। তাই আইন করে বা আইনের সাহায্যে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হলে এক্ষেত্রে বিরাজমান প্রতিবন্ধকতা দূর করতে ধারা সংরক্ষণ প্রত্যাহার করা জরুরি। আপত্তি প্রত্যাহার করলে তা নারীকে নৈতিক ও আইনগত শক্তি যোগাবে। নারী ব্যক্তি ও গোষ্ঠীগতভাবে সংবিধানসম্মত অধিকার দাবি করতে পারে। নারী-পুরুষের সমতা সৃষ্টির জন্য যা অত্যন্ত জরুরি। এদেশে এখনো অভিন্ন পারিবারিক আইন চালু হয় নি। সিডও-র এই ধারাটি অনুমোদিত হলে সরকার ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সব নারীর জন্য একই ধরনের পারিবারিক আইন চালু করতে বাধ্য হতো।

বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সর্বশেষ জাতীয় সংসদের আইন, বিচার এবং সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সিডও সনদের ধারা ২ ও ধারা ১৬-১ (গ) থেকে আপত্তি বা সংরক্ষণ প্রত্যাহারের পক্ষে মতামত প্রদান করেছে। তারপরও এ ব্যাপারে এখন পর্যন্ত কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় নি। রাজনৈতিক দলের মেনিফেস্টোতে এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট অঙ্গীকার থাকা দরকার।

বেইজিং প্লাটফরম ফর অ্যাকশন (Beijing Platform for Action—PFA)

নারী-পুরুষের মধ্যে বিরাজমান এমনকি দেশ ও ক্ষেত্রবিশেষে ক্রমবর্ধমান বৈষম্যের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৯৫ সালে বেইজিংয়ে অনুষ্ঠিত চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনে বেইজিং প্লাটফরম ফর অ্যাকশন গৃহীত হয়। এতে নারীর প্রতি বৈষম্য এবং এর ফলে নারীর পশ্চাৎপদতা ও এর প্রতিকারের উদ্দেশ্যে শিক্ষাসহ অন্যান্য ক্ষমতায়নের কৌশল ও কর্মপদ্ধতি এবং তার বাস্তবায়নের পন্থা নিয়ে নীতি ও দিকনির্দেশনা রয়েছে।

নারীর ক্ষমতায়ন ও জেন্ডার সমতা বিষয়ে অনুষ্ঠিত বেইজিং প্লাটফরম ফর অ্যাকশন কর্তৃক ১২টি সংকটপূর্ণ ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়েছে। চিহ্নিত সংকটপূর্ণ ক্ষেত্রসমূহ হচ্ছে নারী এবং দারিদ্র্য, নারীর শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও স্বাস্থ্য, নারীর প্রতি সহিংসতা এবং সংঘাত, নারী এবং অর্থনীতি, নারীর ক্ষমতায়ন এবং সিদ্ধান্তগ্রহণে নারীর অংশগ্রহণ, নারীর মানবাধিকার, প্রচারমাধ্যমে নারীর অবস্থান, নারী ও পরিবেশ এবং মেয়েশিশু। জাতিসংঘের সকল সদস্য রাষ্ট্র কর্তৃক বেইজিং প্লাটফরম ফর অ্যাকশন অনুসমর্থিত হয়েছে।

বেইজিং কর্মপরিকল্পনার আলোকে পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি প্রণয়ন করা হয়েছে।

সহস্রাব্দ উন্নয়ন ঘোষণা (Milenium Development Goals—MDGs)

২০০০ সালে গৃহীত মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোলে বিশ্বকে দ্রুত দারিদ্র্য ও ক্ষুধামুক্ত করা, জেন্ডার বৈষম্য নির্মূল এবং বিশ্ববাসীকে শিক্ষিত করে একটি নির্মল ও রোগমুক্ত পরিবেশ সৃজনে যে আটটি লক্ষ্যমাত্রা গ্রহণ করা হয়, সেগুলো হলো : ১. চরম দারিদ্র্য ও ক্ষুধা দূরীকরণ, ২. ছেলে ও মেয়ে সকলের জন্য সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন, ৩. লিঙ্গ সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন ত্বরান্বিত করা, ৪. শিশুমৃত্যুর হার হ্রাস করা, ৫. মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নয়ন ঘটানো, ৬. এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ করা, ৭. পরিবেশবান্ধব উন্নয়ন নিশ্চিত করা এবং ৮. উন্নয়নের জন্য বিশ্বব্যাপী অংশীদায়িত্ব সৃষ্টি করা।

উল্লিখিত বিষয়সমূহ বিবেচনায় নিয়ে নারী-পুরুষের বৈষম্য নিরসনের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ও পিআরএসপি দলিল প্রণয়ন করা হলেও সম্ভবত এর বাস্তবায়নে পুরুষশাসিত সমাজের সংকল্পের অভাবে নারীর অবস্থান অনেক ক্ষেত্রেই প্রান্তিকতার গণ্ডি পার হতে পারে নি। গত পনের বছরে উল্লিখিত বিষয়সমূহের মধ্যে সামাজিক ও শিক্ষাখাতে কিছু অগ্রগতি ছাড়া নারী-পুরুষের সমতা অর্জনে মৌলিক পরিবর্তনগুলো সাধিত হয় নি। প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত সংসদ সদস্যের সংখ্যার অনুপাতে, মন্ত্রিসভায় প্রতিনিধিত্বে, উচ্চতর প্রশাসনিক ক্ষেত্রে পদায়নে, ব্যবসা-বাণিজ্যে অংশীদারিত্বের ক্ষেত্রে নারীর অবস্থান এখনো নগণ্য।

আন্তর্জাতিক সনদের ভিত্তিতে জাতীয় কর্মসূচি

দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র (Poverty Reduction Strategy Paper—PRSP)

২০০২ সালে বিশ্বব্যাংকের তাগিদে অর্থ মন্ত্রণালয়ের ইআরডি ন্যাশনাল স্ট্র্যাটেজি ফর ইকোনমিক গ্রোথ নামে খসড়া দলিল প্রকাশ করে। সংক্ষেপে এই খসড়া দলিল পোভার্টি রিডাকশন স্ট্র্যাটেজি পেপার (পিআরএসপি) নামে আখ্যায়িত হয়। তারপর ২০০৫ সালে এই খসড়া দলিলটি একটি চূড়ান্ত রূপে আনলকিং দ্য পটেনশিয়াল : ন্যাশনাল স্ট্র্যাটেজি ফর অ্যাকসেলেরেটেড পোভার্টি রিডাকশন নামে পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ থেকে প্রকাশ করা হয়। এটাই ছিল বাংলাদেশের প্রথম পিআরএসপি।

বাংলাদেশের প্রথম দারিদ্র্য নিরসন কৌশলপত্র বা পিআরএসপি'র বাস্তবায়নকাল ছিল জুলাই ২০০৫ থেকে জুন ২০০৮ পর্যন্ত। সহস্রাব্দ উন্নয়নের লক্ষ্যসমূহসহ বাংলাদেশের অন্যান্য উন্নয়ন লক্ষ্য ২০১৫ সালের মধ্যে বাস্তবায়নের জন্য প্রথম পিআরএসপি প্রণয়ন করা হয়। প্রথম পিআরএসপির অনেক উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ইতোমধ্যেই অর্জিত হয়েছে। পিআরএসপি প্রণয়নে MDG-র লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি,

আঞ্চলিক দারিদ্র্য বৈষম্য নিরসন এবং সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। এই পিআরএসপির ভূমিকায় এবং কৌশল নির্ধারণের ক্ষেত্রে যে ১২টি বিষয়কে ইস্যু হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে, সেখানে নারীর অগ্রযাত্রা এবং জেন্ডার মেইনস্ট্রিমিংয়ের কথা বলা হয়েছে। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছাড়াও দারিদ্র্য নিরসনকল্পে গৃহীত কৌশলে জেন্ডার সম্পর্কিত নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ স্থান পেয়েছে :

- অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মূলস্রোতে নারীর পরিপূর্ণ অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ;
- অরক্ষিত এবং ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থা থেকে নারীদের রক্ষা করার বিষয়টি নিশ্চিতকরণ;
- নারীর বিরুদ্ধে সংঘটিত সহিংসতার অবসান ঘটানো;
- নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নসহ সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অংশগ্রহণ জোরদারকরণ;
- লিঙ্গ সমতা এবং নারীর ক্ষমতায়ন।

দুঃখজনক হলেও সত্য যে, পিআরএসপিতে বর্ণিত উল্লিখিত লক্ষ্যসমূহ থেকে বাংলাদেশ এখনো অনেক দূরে অবস্থান করছে। প্রথম পিআরএসপির কার্যকাল ৩০ জুন, ২০০৮-এ শেষ হয়ে গেছে। দ্বিতীয় পিআরএসপি পরবর্তী তিন বছরের জন্য (২০০৮-২০১১) হবার কথা ছিল। যার খসড়াও প্রণয়ন করা হয়েছিল 'মুভিং এহেড : ন্যাশনাল স্ট্র্যাটেজি ফ্র্র অ্যাকসেলেরেটেড পোভার্টি রিডাকশন (এনএসএপিআর) ২০০৯-২০১১' নামে। কিন্তু এ দ্বিতীয় পিআরএসপি বা এনএসএপিআর-এও প্রথম পিআরএসপির দুর্বলতাগুলো থেকে মুক্ত হওয়ার কোনো সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা খুঁজে পাওয়া যায় নি।

এটি বর্তমানে সারা পৃথিবীতে একটি সর্বজনগ্রাহ্য প্রতিপাদ্য যে, নারীর আইনগত, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন, তার বিরুদ্ধে বৈষম্য দূরীকরণ ও নির্যাতন রোধ ব্যতীত দারিদ্র্য দূরীকরণ সম্ভব নয়।[২৩] তাই সংগত কারণে সকল সুবিবেচক নাগরিকই আশা করবেন পিআরএসপিতে এ বিষয়টি অগ্রাধিকার পাবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় প্রথম পিআরএসপির মতো দ্বিতীয় খসড়া পিআরএসপিতেও ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য দূরীকরণে তেমন কোনো যৌক্তিক কৌশল পরিকল্পনা করা হয় নি, বরং কৌশল নির্ধারণে জেন্ডার ইস্যুটিকে প্রান্তিক অবস্থানে ঠেলে দেয়া হয়েছে।

ন্যাশনাল স্ট্র্যাটেজি ফর অ্যাকসেলেরেটেড পোভার্টি রিডাকশন-এর জন্য নির্ধারিত কর্মকৌশলে নারী বা জেন্ডারকে বিবেচনায় আনা হয় নি। মূল কৌশলগুচ্ছকে সহায়তা দেবার জন্য যে সহায়ক কৌশলগুলোর কথা বলা হয়েছে, তার একটি হচ্ছে 'অংশগ্রহণ'। এই অংশগ্রহণের কর্মকৌশল সুনির্দিষ্ট করা হয় নি। আদিবাসী, প্রতিবন্ধী এবং অন্যান্য সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠীর নারীদের মূলস্রোতে আনার ব্যাপারেও কোনো

---

[২২] 'Moviing Ahead: National Strategy For Acclerated Poverty Reduction (NSAPR) 2009-2011' (First Draft) General Economic Division, Planning commission, GoB, May, 2008

[২৩] উন্নয়ন নীতিমালা বাস্তবায়নে বাংলাদেশের অগ্রগতি, সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০০৬

নির্দিষ্ট পথরেখা নেই। অর্থাৎ সার্বিকভাবে নারী মূলস্রোতে আসছে না। যদিও এনএসএপিআর-এ বলা হয়েছে যে, প্রতিটি সেক্টরেই নারীর বিষয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করে জেন্ডার মেইনস্ট্রিমিং করা হবে। কিন্তু মূল কৌশলের আওতায় না-আসায় এবং নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণের বিষয়টি না-থাকায় কেবল অংশগ্রহণের পরিপ্রেক্ষিতে নারীকে দেখা এবং মেইনস্ট্রিমিংয়ের নামে নামকাওয়াস্তে বা টোকেন হিসেবে নারীর অংশগ্রহণকে দেখানো হচ্ছে। এই কৌশলগত দুর্বলতার ফলে নারীর সমানাধিকার ও ক্ষমতায়নে কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতির সম্ভাবনা পিছিয়ে পড়বে এবং এর ফলে দারিদ্র্য বিমোচনও অনেকখানি পিছিয়ে পড়বে বলে আশংকা করা যায়।

অনেকে অবশ্য পিআরএসপির কঠোর সমালোচনা করে থাকেন। তাদের যুক্তি মতে, সাংবিধানিক বিধি হলো— 'রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে উৎপাদনশক্তির ক্রমবৃদ্ধিসাধন এবং জনগণের জীবনযাত্রার বস্তুগত ও সংস্কৃতিগত মানের দৃঢ় উন্নতিসাধন' (অনুচ্ছেদ ১৫) এবং এ লক্ষ্যে 'উৎপাদনযন্ত্র, উৎপাদনব্যবস্থা ও বণ্টনপ্রণালী-সমূহের মালিক বা নিয়ন্ত্রক হইবেন জনগণ এবং এই উদ্দেশ্যে মালিকানা ব্যবস্থা হবে গুরুত্ব ক্রমানুসারে যথাক্রমে রাষ্ট্রীয়, সমবায়ী ও ব্যক্তিগত মালিকানা' (অনুচ্ছেদ ১৩)। আর এর সবই হবে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায়। কিন্তু আমাদের দেশে জনগণের নির্বাচিত সংসদে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের 'অপ্রয়োজনীয়তা' নিয়ে কোনো আলাপ-আলোচনা ছাড়াই দাতাদের আদেশ-নির্দেশ-তত্ত্বাবধানে প্রণীত হয় পিআরএসপি।[২৪] এ ব্যাপারে রাজনৈতিক দলগুলোর ইশতেহারে সুনির্দিষ্ট বক্তব্য ও অঙ্গীকার থাকা জরুরি।

আশার কথা, বর্তমান নির্বাচিত সরকার জনগণের এই অংশের মতের অনুকূলে আবারও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এটি বাস্তবায়িত হলে পিআরএসপির চিহ্নিত সমস্ত সীমাবদ্ধতা থেকে হয়ত আমরা উত্তীর্ণ হতে পারব।

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা

বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৭ সালে প্রথম একটি জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা ঘোষণা করে এবং পরবর্তী সময়ে উক্ত নীতিমালার ওপর ভিত্তি করে প্রত্যেকটি মন্ত্রণালয়ের জন্য জাতীয় কর্মপরিকল্পনা তৈরি হয়। এই নীতিমালা প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন নারী ও মানবাধিকার সংগঠন এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের সুপারিশ ও মতামত নেওয়া হয়। ফলে সংশ্লিষ্ট সবার কাছেই এই নীতিমালাটি গ্রহণযোগ্য ও সমাদৃত হয়। মূলত বেইজিং প্ল্যাটফরম ফর অ্যাকশন (পিএফএ) ১৯৯৫-এর আলোকে প্রণীত এই নীতিমালা নারীর অগ্রগতি ও অধিকার প্রতিষ্ঠার দিক-নির্দেশক হিসেবে বিবেচিত হয়। কিন্তু ২০০৪ সালে পরবর্তী সরকারের শাসনামলে নারী উন্নয়ন নীতিতে বেশ কিছু সংশোধনী ও পরিবর্তন আনা হয়। এর ফলে জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর সমঅংশগ্রহণ ও অংশীদারিত্ব খর্ব হওয়ার আশংকা দেখা দেয়।

---

[২৪] আবুল বারাকাত, নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন, যা ভাবতে হবে, দৈনিক ইত্তেফাক, ১১ সেপ্টেম্বর ২০০৮

নারী উন্নয়ন নীতিমালা, ২০০৪-এ নারীর অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতায়ন, জাতীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীর সমঅধিকার, সিদ্ধান্ত গ্রহণের সর্বোচ্চ স্তর এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ উচ্চপদে নারীর নিয়োগ ইত্যাদি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা-উপধারায় পরিবর্তন আনা বা বাদ দেওয়ার কারণে নারীর অগ্রগতি ও অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হবে এবং এই পরিবর্তন ও সংশোধন জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালার মূল লক্ষ্যের পরিপন্থী— এই বিবেচনায় নারী অধিকার সংগঠনগুলো সে সময় এই নীতিমালার বিরোধিতা করেছিল। ১৯৯৭ সালের নীতিমালা পুনর্বহালের দাবিতে তারা দীর্ঘদিন ধরে সম্মিলিতভাবে আন্দোলন-সংগ্রামও করেছে। এই প্রেক্ষাপটে ড. ফখরুদ্দীন আহমদের নেতৃত্বাধীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ২০০৮-এর ৮ মার্চ সংশোধিত জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ঘোষণা করে। কিন্তু এই নীতি ঘোষণার পর মৌলবাদী আস্ফালনের মুখে আবারো সরকারের পক্ষ থেকে এই নীতি পর্যালোচনার জন্য কমিটি গঠন করার ঘটনা নারী আন্দোলনের কর্মীদের ক্ষুব্ধ ও হতাশ করেছে। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন সরকার ক্ষমতায় আসার পর ১৯৯৭-এ প্রণীত মূল নারী উন্নয়ন নীতিটিই পুনরায় কার্যকর ও বাস্তবায়িত হওয়ার সম্ভাবনা সূচিত হয়েছে। সরকার এটি বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছে। আমরা মনে করি, এই নীতিটি বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণের পাশাপাশি ক্রমশ এর আধুনিকায়নের দিকেও আমাদের মনোযোগ দিতে হবে।

নারীর ক্ষমতায়নে সরকার গৃহীত সাম্প্রতিক ইতিবাচক পদক্ষেপ

- সিডও সনদ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০০৮ সুপারিশমালা পেশ।
- নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সরকার ২০০৮ সালের মে মাসে নতুন করে জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন পরিষদ পর্যায়ে নারীর জন্য সরাসরি ভোটে ভাইস চেয়ারম্যান পদ সংরক্ষণ করার নীতি প্রণয়ন।
- ২০০৮ সালের জুন মাসে নির্বাচন কমিশনার নিয়োগবিধির খসড়াতে একজন সিইসি ও দুই কমিশনারের একজনকে অবশ্যই নারী হতে হবে উল্লেখ করে নতুন খসড়া বিল আনা।
- নির্বাচন কমিশনার কর্তৃক রাজনৈতিক দলগুলোর নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে ৩৩ শতাংশ নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য বিধান রাখার উদ্যোগ।

২০০৮ সালে ঘোষিত নারী উন্নয়ন নীতিমালার ইতিবাচক দিকসমূহ

এতে ১৯৯৭ সালের নীতিমালা ও নীতিমালা বাস্তবায়নের কৌশলসমূহের কিছু কিছু সময়ানুগ এবং যথোপযুক্ত পরিবর্তন সাধন করা হয়েছে, ২০০৪ সালের সংশোধনীর যে বিষয়গুলোতে নারী ও মানবাধিকার সংগঠনগুলো আপত্তি জানিয়েছিল, সেগুলো বাদ দেয়া হয়েছে এবং নতুন কিছু ইতিবাচক উদ্যোগ নেয়ার কথা বলা হয়েছে।

এই নীতিমালায় দরিদ্র নারীদের উন্নয়নের দিকনির্দেশনা সংবলিত একটি নতুন উপধারা (ধারা ৯-এ) সংযোজন করা হয়েছে, যা বেইজিং প্ল্যাটফরম ফর অ্যাকশনের 'নারী ও

দারিদ্র্য' সংক্রান্ত রূপরেখার সঙ্গে এবং পিআরএসপির মূল স্পিরিটের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

নীতিমালায় নারীর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমঅধিকারের স্বীকৃতি প্রদান এবং বৈষম্য দূর করার কথা বলা হয়েছে। সংসদে নারীর জন্য এক-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণ এবং সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচনের উদ্যোগে নেয়ার কথা বলা হয়েছে (ধারা ১০.৫), যা নারী সংগঠনগুলোর দীর্ঘদিনের প্রত্যাশার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ।

সম্পদ, কর্মসংস্থান, বাজার ও ব্যবসায়ে নারীর সমান সুযোগ ও অংশীদারিত্বের কথা বলা হয়েছে, যা নারীর অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ হওয়ার পক্ষে ইতিবাচক। এটি বেইজিং পিএফএ-র 'নারী ও অর্থনীতি' শীর্ষক রূপরেখার অনুরূপ।

প্রশাসনসহ বিভিন্ন উচ্চপর্যায়ের পদে এবং নীতিনির্ধারণী পদে নারীর নিয়োগ, বিদেশের শ্রমবাবাজারে নারীর অধিকতর অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টির উদ্যোগ (ধারা ৯.১৪.৭), কর্মজীবী নারীর শিশুযত্নের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি, মাতৃত্বকালীন ছুটি পাঁচ মাস করা (ধারা ১২.১০) ইত্যাদি নতুন পদক্ষেপ কর্মক্ষেত্রে নারীর বর্ধিতহারে অংশগ্রহণ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভূমিকা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। এগুলো নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ বা সিডও সনদের ধারা ৪, ৭ এবং ১১-এর সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। এছাড়াও নীতিমালার বিভিন্ন ধারায় প্রতিবন্ধী নারীদের সহায়তা দান, জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রণয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন ইত্যাদি বিষয় যুক্ত করা হয়েছে এবং জেন্ডার ইস্যুকে একটি ক্রস কাটিং ইস্যু হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে, যা সামগ্রিক বিচারে নারীর জন্য ইতিবাচক ফলাফল বয়ে আনবে বলে নারীসমাজের পক্ষ থেকে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়েছে।

নীতিমালার ত্রুটিসমূহ

১৯৯৭ সালের নীতিমালার ৭.২ ধারায় নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে জরুরি বিষয়াদি যথা স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, জীবনব্যাপী শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা, তথ্য, উপার্জনের সুযোগ, উত্তরাধিকার, সম্পদ, ঋণ, প্রযুক্তি এবং বাজার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অর্জিত সম্পদসহ ভূমির ওপর অধিকার ইত্যাদির ক্ষেত্রে নারীর পূর্ণ ও সমান সুযোগ এবং নিয়ন্ত্রণের অধিকার দেয়া এবং সেই লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নতুন আইন প্রণয়ন করার কথা বলা হলেও ২০০৮-এর নীতিতে 'পূর্ণ সুযোগ' এবং 'উত্তরাধিকার' ও 'ভূমির ওপর অধিকার' শব্দগুলো তুলে দেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে ২০০৪-এর নীতিতে এ তিনটি শব্দের সঙ্গে 'সম্পদ' শব্দটিও বাদ দেয়া হয়েছিল। অর্থাৎ এখন সম্পদে নারীর সমান সুযোগের বিষয়টি পুনর্বহাল করা হলেও উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্য সম্পদে পূর্ণ বা সমান সুযোগ এবং ভূমির ওপর নারীর অধিকারের বিষয়টি চাপা পড়ে গেছে।

১৯৯৭-এর নীতিমালার ধারা ৮-এ বলা হয়েছে, 'রাজনীতিতে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণের তাগিদ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে নারী সংগঠনসহ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রচার অভিযান গ্রহণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হবে।' ২০০৪ সালে সংশোধিত নারী

উন্নয়ন নীতিমালার খসড়ায় এটি বাদ দেয়া হয়েছিল এবং এবারের নীতিমালায়ও এটি রাখা হয় নি। ফলে এক্ষেত্রে বেসরকারি ও নারী সংগঠনসমূহের ভূমিকা খর্ব হওয়ার শঙ্কা রয়েছে। এছাড়া নীতিমালাটি বাস্তবায়ন কৌশলের ক্ষেত্রে সরকারি এবং বেসরকারি সংগঠনসমূহের মধ্যে যে সহযোগিতার (১৯৯৭, ধারা ৭) কথা উল্লেখ করা হয়েছিল, বর্তমান নীতিতে সেই ধারাটি বাদ দেয়া হয়েছে এবং অন্য ধারায় এটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

চাই বাস্তবায়ন কৌশল ও কর্মপদ্ধতি

তবে এই নারী উন্নয়ন নীতিমালায় যেসব ক্ষেত্রে ইতিবাচক উদ্যোগের কথা বলা হয়েছে সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য কৌশল ও কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করাই এ মুহূর্তে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় কাজ। যেমন নীতিমালার ১১ ধারায় নির্দিষ্ট সংখ্যক কোটা পূরণ করে সরকার ও প্রশাসনে নারীদের অংশগ্রহণের জন্য যথাযথ পদক্ষেপ নেয়ার ওপর গুরুত্বারোপ করা হলেও প্রকৃতপক্ষে সেই কোটার ধারে-কাছেও এখনো পৌঁছানো যায় নি। ফলে এ খাতে বাজেট বরাদ্দের সিংহভাগই চলে যায় পুরুষদের কাছে। তেমনি প্রাথমিক স্তরের শিক্ষায় ৬০ শতাংশ নারী কোটার লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয় নি। এসব কারণে নীতিমালা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এখনো অনেকদূর পথ পাড়ি দিতে হবে।[২৫] নীতিমালায় সম্পদ, কর্মসংস্থান, বাজার এবং ব্যবসায়ে নারীর সমান অংশগ্রহণ ও অংশীদারিত্বের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে নারীর বর্তমান অবস্থা বিবেচনা করলেই বাস্তবতাটি বোঝা যাবে। সম্পদে নারীর অধিকারের বিষয়টিই ধরা যাক। নীতিমালায় সম্পদে সমান সুযোগের কথা বলা হলেও উত্তরাধিকারের বিষয়ে কিছু বলা হয় নি। আমাদের দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসংখ্যার মুসলিম নারীরা উত্তরাধিকার সূত্রে পুরুষের তুলনায় অর্ধেক সম্পত্তি পায়, পক্ষান্তরে হিন্দু নারীরা প্রায় কিছুই পায় না। সংবিধানে নারী-পুরুষের সমঅধিকারের নিশ্চয়তা বিধানের কথা বলা হলেও ব্যক্তিগত বা পারিবারিক বিষয়গুলোর নিষ্পত্তি হয় স্ব স্ব ধর্মভিত্তিক আইন দ্বারা, যা নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক এবং অসামঞ্জস্যপূর্ণ। অর্থাৎ এসব আইন যতদিন পর্যন্ত পরিবর্তন বা সংস্কার করা না-যাবে ততদিন পর্যন্ত সম্পদে ও উত্তরাধিকারে নারী-পুরুষের সমতা বা সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে না।[২৬] উল্লেখ্য, এই বিষয়টি সিডও সনদের যে ধারায় (ধারা ২) উল্লেখ করা হয়েছে, বাংলাদেশ তাতে দীর্ঘদিন ধরে সংরক্ষণ আরোপ করে রেখেছে। দীর্ঘদিন ধরে নারী অধিকার সংগঠনগুলোর অব্যাহত দাবি সত্ত্বেও কোনো সরকারই এ সংরক্ষণ বিলোপের জন্য সক্রিয় উদ্যোগ নেয় নি।

বাংলাদেশের মতো দেশে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী তথা নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের জন্য নীতিমালা প্রণয়ন অবশ্যই একটি জরুরি বিষয়। নীতিমালা প্রণয়নের মধ্য দিয়ে একটি ইতিবাচক প্রক্রিয়ার শুরু হয়েছে। এখন যত দ্রুত সম্ভব মাঠপর্যায়ে এই নীতির বাস্তবায়নে এগিয়ে যাওয়া দরকার। এই নীতিমালার ভিত্তিতে আগামীতে দ্বিতীয়

[২৫] জাহানারা হক, জাতীয় উন্নয়নের প্রেক্ষিতে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০০৮, সংবাদ, ১০ মে ২০০৮
[২৬] গোলাম মুরশিদ, সরকারকে নারীর স্বার্থেই অবস্থান নিতে হবে, সমকাল, ৭ এপ্রিল ২০০৮

পিআরএসপিতে অর্জনযোগ্য সুনির্দিষ্ট সময়সীমা এবং টার্গেট উল্লেখসহ জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। এবং এর বাস্তবায়ন ও নিয়মিত পরিবীক্ষণ প্রক্রিয়ায় এবং উইড ফোকাল পয়েন্টদের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে বেসরকারি সংগঠন তথা সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের সম্পৃক্ত করতে হবে।

নীতিমালায় বর্ণিত জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রক্রিয়াটিও সঠিকভাবে অনুসরণ করা জরুরি। এই নীতিমালাকে জাতীয় পর্যায় থেকে শুরু করে স্থানীয় ও তৃণমূল পর্যন্ত ছড়িয়ে দিতে কর্মসূচি ও কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

বিশেষ করে নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক আইন বাতিল করে নতুন আইন প্রণয়নের ব্যাপারে তাদের সুনির্দিষ্ট অঙ্গীকার ও ভাবনার কথা উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।[২৭] মনে রাখা দরকার যে, এই নীতিমালাটি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে প্রবর্তিত হলেও এর বাস্তবায়নের দায়িত্ব কিন্তু নির্বাচিত রাজনৈতিক সরকারের। রাজনৈতিক দলগুলো যাতে ক্ষমতায় গিয়ে এতে অনাকাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন না-আনে বা বাস্তবায়নে গড়িমসি না-করে, এ ব্যাপারে অঙ্গীকার থাকতে হবে।

[২৭] আইন ও সালিশ কেন্দ্র, জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০০৮ : বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা চাই, প্রথম আলো, ১৯ এপ্রিল ২০০৮

নির্বাচনী ইশতেহারে নারী

নারীসমাজের ২০০৮-এর সাধারণ নির্বাচনপূর্ব আন্দোলন ও দাবি

কেবল ২০০৮ সালেই নয়, দেশের নারীসমাজ বরাররই নির্বাচনের প্রাক্কালে নারীর ক্ষমতায়নের ইস্যুগুলো সামনে নিয়ে আসে, যাতে রাজনৈতিক দলগুলো তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে নারীসমাজের দাবিসমূহ অন্তর্ভুক্ত করে। এই দাবির প্রধান ভিত্তি দেশের সংবিধানে বর্ণিত নারী-পুরুষ সমতা প্রতিষ্ঠায় রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতা এবং নারীসহ পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়নের প্রতিশ্রুতি। নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনী ইশতেহারে যুক্ত করার জন্য নারীসমাজের দাবিসমূহের মধ্যে নিম্নলিখিত ইস্যুগুলো প্রাধান্য পায়। এর পাশাপাশি বলা হয় যে, অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য উপযুক্ত কর্মকৌশলও ইশতেহারে উল্লেখ থাকা দরকার। উল্লেখ্য, এখানে বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, সামাজিক প্রতিরোধ কমিটি ও স্টেপস টুওয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট-এর দাবিসমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

- প্রতিটি রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইশতেহারে নারী-পুরুষের সমঅধিকারসহ সমতাভিত্তিক রাষ্ট্র ও সমাজ গড়ে তোলার অঙ্গীকার থাকতে হবে। নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে সরকার গঠনের পর এই অঙ্গীকার বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি জনগণকে দিতে হবে।
- রাজনৈতিক কৌশলের নামে কোনোক্রমেই রাজাকার, আলবদর, আলশামস, যুদ্ধাপরাধী, জামায়াত, স্বৈরাচারী, নারী নির্যাতনকারী, সন্ত্রাসী, গডফাদারদের সাথে কোনোপ্রকার ঐক্য গড়ে তোলা যাবে না। তাদেরকে মনোনয়ন দানে বিরত থাকতে হবে।
- মুক্তিযুদ্ধবিরোধী ও মৌলবাদীদের প্রার্থী হওয়ার বিরুদ্ধে দলের পক্ষ থেকে সক্রিয় প্রচারণা চালাতে হবে। ধর্মভিত্তিক রাজনীতি এবং নির্বাচনী প্রচারণা বন্ধ করার জন্য সকল পর্যায়ের নেতা-কর্মীদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে।
- অধিক হারে নারীপ্রার্থীদের মনোনয়ন দিতে হবে এবং মনোনীত প্রার্থীদের জিতিয়ে আনার জন্য সার্বিক উদ্যোগ নিতে হবে।
- প্রশাসনিক কাঠামোর উচ্চপর্যায়, বাংলাদেশের বিদেশী দূতাবাসগুলোর রাষ্ট্রদূত ও জাতিসংঘের বিভিন্ন শাখা, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, বিশ্ববিদ্যালয়র মঞ্জুরি কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন, ভূমি বণ্টন কমিটি এবং উচ্চ আদালতসহ বিচার বিভাগে নারীর অংশগ্রহণের বিশেষ উদ্যোগ নিতে হবে।
- নারী-পুরুষের সমতাপূর্ণ বাংলাদেশের সংবিধান ও সিডও সনদের আলোকে পূর্ণাঙ্গ নাগরিকত্ব আইন প্রণয়ন করতে হবে।
- খাদ্য নিরাপত্তা দেয়াসহ নারী-পুরুষের সমঅধিকারভিত্তিক ভূমি মালিকানা ব্যবস্থা সংস্কার করতে হবে। এজন্য অবিলম্বে ভূমি কমিশন গঠন ও খাদ্য নিরাপত্তা আইন প্রণয়ন করতে হবে।

- সংশোধনীসহ অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন ২০০১ অবিলম্বে কার্যকর করতে হবে।
- জাতিসংঘ ঘোষিত সিডও সনদের ২ ও ১৬ (গ) ধারার সংরক্ষণ প্রত্যাহার করে পূর্ণ অনুমোদন ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিতে হবে এবং নারীর মর্যাদা বিষয়ক কমিশন গঠন করতে হবে।
- ১৯৭২ সালের সংবিধান পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করতে হবে এবং অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ে তুলতে হবে।
- জাতিসংঘের আদিবাসী অধিকার বিষয়ক ঘোষণাপত্র বাংলাদেশ সরকারকে সমর্থন করতে হবে। আদিবাসীদের ঐতিহ্যগত ভূমি অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিতে হবে, যেখানে তাদের আত্মপরিচয় ও সংস্কৃতির উল্লেখ থাকবে।
- একটি বিজ্ঞানসম্মত ও ন্যায়ভিত্তিক শিক্ষানীতি প্রণয়ন করতে হবে।
- ফতোয়াকে আইনগতভাবে বেআইনি ঘোষণা করতে হবে। এজন্য ২০০১ সালের হাইকোর্টের ঐতিহাসিক রায়কে কার্যকর করতে হবে।
- জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন সংখ্যা এক তৃতীয়াংশে উন্নীতকরণ ও সরাসরি নির্বাচন ব্যবস্থা চালু করতে হবে।
- ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করতে হবে, যাতে কোনো দলই রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার না-করতে পারে।
- যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের প্রতিশ্রুতি দিতে হবে।
- দেশের শতকরা ৬০ ভাগ পরিবার ভূমিহীন। খাদ্য নিরাপত্তা দেয়াসহ নারী-পুরুষের সমঅধিকারভিত্তিক ভূমিমালিকানা ব্যবস্থা সংস্কার করতে হবে। সংশোধনীসহ অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন ২০০১ অবিলম্বে কার্যকর করতে হবে।
- নারীশ্রমিক, আদিবাসী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সকল মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।
- বেইজিং প্লাটফরম ফর অ্যাকশন-এর বাস্তবায়নের জন্য কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য আশু পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।
- জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা বাস্তবায়নে কর্মসূচি এবং কর্মকৌশল গ্রহণ করতে হবে।
- মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে শক্তিশালী করা এবং এ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে একজন পূর্ণমন্ত্রী নিয়োগ করতে হবে।
- উত্তরাধিকার আইন সংস্কার করে সম্পত্তিতে নারীর সমঅংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
- জাতীয় বাজেটে সরাসরি নারীর জন্য ১৫ শতাংশ বরাদ্দ রাখা ও তার কার্যকর ব্যয় নিশ্চিত করতে হবে।

- প্রচলিত সকল শিক্ষা কারিকুলাম থেকে নারীবিরোধী সকল অনুষঙ্গ বাদ দিয়ে যুগোপযোগী শিক্ষা কার্যক্রম চালু করতে হবে।
- নারীর গৃহস্থালি কাজে সুবিধার জন্য প্রাকৃতিক গ্যাস, বিশুদ্ধ পানি ও বিদ্যুৎ সরবরাহ সহজলভ্য করতে হবে।
- সারাদেশে নারী নির্যাতন বন্ধ, নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি বন্ধ করার জন্য তারা কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন তা সুস্পষ্ট করতে হবে।
- সকল প্রকার আইন, পিআরএসপিসহ সকল জাতীয় দলিল থেকে নারীবিরোধী উপাদান দূর করতে হবে।
- নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম কমানোর ক্ষেত্রে তারা কী পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন তা সুস্পষ্ট করতে হবে।
- মানসম্মত শিশুখাদ্য, ওষুধ, সবার জন্য খাদ্য নিশ্চিত করার জন্য তারা কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন তা চিহ্নিত করতে হবে।
- নারীসহ সকলের যাতায়াত সহজলভ্য ও সুশৃঙ্খল করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পানীয়জল ও স্যানিটেশনকে অপরিহার্য সেবা হিসেবে বিবেচনা করে সকল নাগরিকের জন্য এর ব্যবস্থা করতে হবে।

নারীর ক্ষমতায়নে রাজনৈতিক দলসমূহের অঙ্গীকার

রাজনীতিতে নারীর সমঅংশগ্রহণ ছাড়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা শক্তিশালী ও কার্যকর হওয়া সম্ভব নয়। অথচ স্বাধীনতার পর ১৯৯০ সাল পর্যন্ত রাজনৈতিক দলগুলোর অ্যাজেন্ডায় নারীর ক্ষমতায়ন প্রসঙ্গটি তেমনভাবে স্থান পায় নি। ১৯৯১ সালের নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনী ইশতেহারে নারীর ক্ষমতায়ন প্রসঙ্গটি প্রচ্ছন্নভাবে হলেও প্রথম স্থান পায়। মূলত ১৯৯৬ ও ২০০১ সালের নির্বাচনে রাজনৈতিক দলসমূহ তাদের ইশতেহারগুলোতে নারীগোষ্ঠীর উন্নয়ন নিয়ে পৃথকভাবে অঙ্গীকার করেছে। এখানে ২০০৮ সালের নির্বাচনে প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহের সাধারণ নির্বাচনপূর্ব নির্বাচনী ঘোষণা ও ইশতেহারের বক্তব্য থেকে সরাসরি অঙ্গীকার তুলে আনা হয়েছে।

২০০৮-এর নির্বাচনে বিভিন্ন দলের ইশতেহারে নারী ইস্যু

সব দিক দিয়ে এবারের নির্বাচন নিয়ে জনগণের উৎসাহ ছিল উল্লেখ করার মতো। পাশাপাশি নারীপ্রার্থী ও ভোটারদের বিপুল অংশগ্রহণও জনমনে বাড়তি আগ্রহ সৃষ্টি করেছিল। নারী অধিকারের বিষয়টি রাজনৈতিক ইশতেহারে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হলেও এবারের নির্বাচনে একেকটি দলের ইশতেহারে তা এসেছে একেকভাবে। আওয়ামী লীগ ছাড়া দেশের অন্য বড়ো বড়ো রাজনৈতিক দলের ইশতেহারে নারী উন্নয়ন বিষয়ক বিশেষ কোনো অনুচ্ছেদ সেভাবে পরিলক্ষিত হয় নি। বিএনপির ইশতেহারে নারী উন্নয়ন ইস্যুটিকে বলা হয়েছে 'নারীসমাজ ও শিশু', জাতীয় পার্টির ইশতেহারে নামকরণ করা হয়েছে 'নারী ও শিশু বিষয়ক অধিকার' এবং কমিউনিস্ট পার্টির

ইশতেহারে এই ইস্যুটির নাম দেয়া হয়েছে 'নারীসমাজ'। ইশতেহারগুলোতে নারীর সঙ্গে শিশু বিষয়ক ইস্যুটিকে একত্রিত করে বিষয়টা অনেকটাই গুরুত্বহীনতার পর্যায় নিয়ে আসা হয়েছে।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

'দিন বদলের সনদ' নিয়ে আসা দেশের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক এবং বর্তমান ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারের ১২তম অনুচ্ছেদে নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়ে যা বলা হয়েছে, তা হলো :

১২.১ নারীর ক্ষমতায়ন, সম-অধিকার ও সুযোগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে আওয়ামী লীগ সরকার কর্তৃক প্রণীত ' নারী উন্নয়ন নীতি' পুনর্বহাল করা হবে।

১২.২ জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসনের সংখ্যা ৩৩ শতাংশে উন্নীত করা হবে। প্রশাসন ও সমাজের সর্বস্তরের উচ্চপদে নারীদের নিয়োগের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।

১২.৩ নারী নির্যাতন বন্ধে কঠোরতম আইনি ব্যবস্থা নেয়া হবে। নারী ও শিশু পাচার রোধে আঞ্চলিক সহযোগিতাসহ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১২.৪ নারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বৈষম্যমূলক আইনসমূহ সংশোধন করা হবে। কর্মক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা, কর্মবান্ধব পরিবেশ ও সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করা হবে।

এছাড়াও আওয়ামী লীগের মানব উন্নয়নে শিক্ষা ও বিজ্ঞান অনুচ্ছেদের ১০.২ ধারায় বলা হয়েছে, নারীশিক্ষা উৎসাহিত করার লক্ষ্যে উপবৃত্তি অব্যাহত রাখা হবে।

বিএনপি

দেশের অপর শক্তিশালী রাজনৈতিক দল বিএনপি 'দেশ বাঁচাও, মানুষ বাঁচাও' স্লোগান নিয়ে ৩২ পৃষ্ঠার নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করে। 'নারীসমাজ ও শিশু' নিয়ে তারা ইশতেহার তৈরি করলেও সেখানে নারী উন্নয়ন নীতি নিয়ে আলাদাভাবে উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল না। ইশতেহারে বলা হয়, দেশে নারী-পুরুষের সংখ্যা প্রায় সমান। নারীদের ক্ষমতায়ন ও মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিএনপি চায় জীবনের সর্বক্ষেত্রেই নারীদের অবস্থান যেন আরো উন্নত হয়। নির্বাচিত হলে এ বিষয়ে বিএনপির কাজগুলো হবে :

- ব্যবসায়ে আগ্রহী ও স্বনিয়োজিত কর্মে নিয়োজিত নারীদের জন্য সহজশর্তে ঋণ দেয়া এবং চাকুরিতে নারীদের নিয়োগ ও পদোন্নতিসহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা বাড়ানো।
- গ্রামীণ নারীদের জন্য মা ও শিশু স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, পরিবেশ, কৃষিকাজ, পশুপালন বিষয়ে বিভিন্ন ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করা।
- গ্রামীণ এলাকায় সরকারি চাকুরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে গ্রামীণ যোগ্য নারী প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেয়া।

- নারী ও শিশু পাচার রোধে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা নেয়াসহ সব কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- প্রসূতি মৃত্যুর হার কমিয়ে আনার জন্য বিগত বিএনপি সরকার কর্তৃক নেয়া সব ব্যবস্থা আরো জোরদার করা। মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যুর হার কমে যাওয়ার ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য সব পদক্ষেপ নেয়া।
- ঢাকাসহ দেশের প্রধান শহরগুলোতে বিভিন্ন স্থানে নারীদের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক আলাদা পাবলিক টয়লেট নির্মাণ করা।
- জাতীয় সংসদসহ সকল পর্যায়ে নারীরা যাতে অধিক হারে নির্বাচিত হতে পারেন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ পর্যায়ে তাদের অংশগ্রহণ যাতে বৃদ্ধি পায় তার উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করা।

শিক্ষা বিষয়ে বিএনপির ইশতেহারে বলা হয়েছে :

- যেসব পেশায় নারীগণ সম্মানজনকভাবে কাজ করতে পারেন, সেসব পেশায় তাদের শিক্ষিত ও দক্ষ করার জন্য বিশেষ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে।
- নারী পেশাজীবী সৃষ্টির লক্ষ্যে আরো মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হবে। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে আরো মহিলা হোস্টেল নির্মাণ করে নারী পেশাজীবীদের আবাসন ব্যবস্থার উদ্যোগ নেয়া হবে।
- মেয়েদের অবৈতনিক শিক্ষা ও উপবৃত্তি স্নাতক শ্রেণী পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হবে।

সবশেষে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর ক্ষেত্রে নারী বিষয়ে উল্লেখ আছে :

- গ্রামাঞ্চলে দুস্থ মহিলাদের জন্য ভিজিডি প্রকল্প এবং কাজের বিনিময়ে খাদ্য কিংবা অর্থ কর্মসূচি জোরদার করা হবে।

জাতীয় পার্টি

জাতীয় পার্টি ঘোষিত ইশতেহারে নারী উন্নয়ন নীতি বিষয়ক কোনো জোরালো দাবি ছিল না। এ দল কর্তৃক ঘোষিত ইশতেহারে বলা হয় :

- নারী অধিকার সুরক্ষার জন্য পারিবারিক আদালতের কার্যকারিতা অধিকতর শক্তিশালী করা হবে।
- সকল ক্ষেত্রে নারীর পূর্ণ ক্ষমতায়ন নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্রের সকল প্রকার সাহায্য ও সহযোগিতা অব্যাহত রাখা হবে।
- সরকারি খরচে দরিদ্র মেয়েদের উচ্চশিক্ষা নিশ্চিত করা হবে। সকল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে মহিলাদের ভর্তির হার ক্রমান্বয়ে বাড়ানো হবে যতদিন না ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা সমান হয়।

- শিক্ষা ও শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং অফিস-আদালতে যৌননিপীড়ন বন্ধের জন্য একদিকে সামাজিক সচেতনতা বাড়ানো হবে এবং অপরদিকে দ্রুত বিচার ও
  শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে।
- আগামী দশ বছরের মধ্যে জাতীয় পার্টিতে ও সরকারে মহিলাদের ন্যূনতম ৩৩% পদ দেয়ার উদ্যোগ নেয়া হবে।
- যে সকল সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে ৫০ বা ততোধিক মহিলা কাজ করেন, সেখানে শিশু পরিচর্যা কেন্দ্র স্থাপন বাধ্যতামূলক করা হবে।

এছাড়াও ক্রীড়া ও সংস্কৃতি অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, সকল খেলাধূলায় মেয়েদের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে।

জামায়াতে ইসলামী

জামায়াতে ইসলামীর ইশতেহারে অ্যাসিড নিক্ষেপ, ঘৃণ্য যৌতুকপ্রথাসহ সব ধরনের নারী ও শিশু নির্যাতন কঠোরভাবে দমনের ঘোষণা দেয়া হয়। এখানে নারী উন্নয়ন নীতি অথবা সমান অধিকারের বিষয়ে কোনো সুস্পষ্ট ঘোষণা আসে নি।

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি

কমিউনিস্ট পার্টির নির্বাচনী ইশতেহারে নারী উন্নয়ন বিষয়ে বিভিন্ন ধারাতে যেভাবে বলা হয়েছে তা নিম্নরূপ :

ক্ষমতার গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ

ঘ. স্থানীয় সরকারের সকল স্তর ও কাঠামোতে পর্যায়ক্রমে এক-তৃতীয়াংশ নারী প্রতিনিধি নিশ্চিত করা।

নারীসমাজ

ক. নারীসমাজের ওপর পরিচালিত নানা অন্যায়-অত্যাচার ও বৈষম্য দূর করে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক পরিমণ্ডলসহ সর্বক্ষেত্রে নারীদের সমান অংশগ্রহণ, সমমর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।

খ. ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘ ঘোষিত মানবাধিকার সনদ, ১৯৭৯ সালে ঘোষিত নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ তথা 'সিডও সনদ' (কোনরকম সংরক্ষণ ছাড়াই), ১৯৯৩ সালে ঘোষিত ভিয়েনা সম্মেলন এবং ১৯৯৫ সালে বিশ্ব নারী সম্মেলনে ঘোষিত বেইজিং কর্মসূচি পূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করা। যৌতুকপ্রথা, ধর্ষণ, এসিড নিক্ষেপ, অপহরণসহ সকল প্রকার নারী নির্যাতন কার্যকরভাবে রোধ করা। নারী ও শিশু পাচার রোধ করতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা। কন্যাশিশুদের অধিকার ও স্বার্থ রক্ষার বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা। 'পারিবারিক নির্যাতন প্রতিরোধ আইন' প্রণয়ন করা। 'ক্রিমিনাল প্রসিডিউর কোড' এবং 'অ্যাভিডেন্স অ্যাক্ট' এ নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক ধারাসমূহ শনাক্ত ও দূর করা। ' অভিভাবক ও পোষ্য আইন ১৮৯০'

সংশোধন করে অভিভাবক ও পোষ্য গ্রহণের বিধানে সমতা আনা। 'ইকুয়াল অপারচুনিটি অ্যাক্ট' প্রণয়ন করা। এসব ছাড়াও বর্তমানে প্রচলিত আইনে যেসব পিতৃতান্ত্রিক বিধান রয়েছে তার অবসান ঘটানো। বিদ্যমান পারিবারিক আইন ও উত্তরাধিকার আইনের ক্ষেত্রে যে বৈষম্য বিরাজ করছে তা দূর করা এবং ইউনিফর্ম ফ্যামেলি কোড চালু করা। সংবিধানের ২৭, ২৮ ও ২৯ ধারার পূর্ণ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা। ২০০৮ সালে ঘোষিত নারী উন্নয়ন নীতিমালাকে আরো বিকশিত করা এবং তার পরিপূর্ণ
বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করা।

গ. কর্মস্থলে শিশু পরিচর্যা কেন্দ্র স্থাপন করা। নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত করা। কর্মজীবী নারীদের জন্য ৩ মাস সবেতন প্রসূতিকালীন ছুটি প্রদানের ব্যবস্থা করা। প্রাথমিক প্রজনন স্বাস্থ্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

ঘ. সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করে এক তৃতীয়াংশ করা ও প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা। জেন্ডার বিষয়ক সংসদীয় কমিশন গঠন করা। মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে একজন পূর্ণমন্ত্রী নিয়োগ দেয়া।

ঙ. নারীর সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। ধর্মান্ধ ফতোয়াবাজ ও প্রভাবশালীদের দৌরাত্ম্য থেকে নারীদের রক্ষা করা। ফতোয়াকে আইনগতভাবে নিষিদ্ধ করে ২০০১ সালে হাইকোর্টে প্রদত্ত ঐতিহাসিক রায়কে কার্যকর করা। গার্মেন্টস, রাইস মিল ও চাতাল, ইটের ভাটা প্রভৃতিসহ বিভিন্ন ছোট বড় সকল শিল্পে কর্মরত নারীদের ন্যূনতম মজুরি প্রদান, কাজের উপযোগী পরিবেশ নিশ্চিত করা। নারী ও পুরুষের মধ্যে কাজ ও মজুরির ক্ষেত্রে সমতা প্রতিষ্ঠা করা।

ছ. নারীর প্রতি অবমাননাকর, নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির সকল অনুষঙ্গ বাদ দিয়ে যুগোপযোগী শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা। নারীর প্রতি নেতিবাচক, গৎবাঁধা, অবমাননাকর, সনাতনী দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে গণমাধ্যমের সঠিক ভূমিকা, প্রচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সকল প্রচার মাধ্যমের জন্য জেন্ডার সংবেদনশীল নীতিমালা প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন করা। রাস্তাঘাটে উত্যক্তকরণ বা ইভটিজিং প্রতিরোধের লক্ষ্যে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের বিধান রেখে আইন প্রবর্তন করা।

জ. প্রান্তিক নারী, সুবিধাবঞ্চিত নারীদের মূলধারায় যুক্ত করার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা। কথিত ' পতিতা'দের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে পুনর্বাসিত করা।

বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি

শিল্প, শ্রমিক ও কর্মচারী

- নারী শ্রমিকদের মাতৃত্বকালীন ছুটি, ভাতাসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা।

ক. ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘ ঘোষিত মানবাধিকার সনদ, ১৯৭৯ সালে ঘোষিত নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ তথা 'সিডও সনদ' (কোনরকম সংরক্ষণ ছাড়াই) ১৯৯৩ সালে ঘোষিত ভিয়েনা সম্মেলন এবং ১৯৯৫ সালে বিশ্ব নারী সম্মেলনে ঘোষিত বেইজিং কর্মসূচি পূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করা হবে।

খ. যৌতুকপ্রথা, ধর্ষণ, এসিড নিক্ষেপ, অপহরণসহ সকল প্রকার নারী নির্যাতন কার্যকরভাবে রোধ করা। নারী ও শিশু পাচার রোধ করতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা। কন্যাশিশুদের অধিকার ও স্বার্থ রক্ষার বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

গ. 'পারিবারিক নির্যাতন প্রতিরোধ আইন' প্রণয়ন করা। 'ক্রিমিনাল প্রসিডিউর কোড' এবং 'অ্যাভিডেন্স অ্যাক্ট'-এ নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক ধারাসমূহ শনাক্ত ও দূর করা। 'অভিভাবক ও পোষ্য আইন ১৮৯০' সংশোধন করে অভিভাবক ও পোষ্য গ্রহণের বিধানে সমতা আনা। 'ইকুয়াল অপারচুনিটি অ্যাক্ট' প্রণয়ন করা। এসব ছাড়াও বর্তমানে প্রচলিত আইনে যেসব পিতৃতান্ত্রিক বিধান রয়েছে তার অবসান ঘটানো। বিদ্যমান পারিবারিক আইন ও উত্তরাধিকার আইনের ক্ষেত্রে যেসব বৈষম্য বিরাজ করছে তা দূর করা এবং ইউনিফর্ম ফ্যামিলি কোড চালু করা।

ঘ. সংবিধানের ২৭, ২৮ ও ২৯ ধারার পূর্ণ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা। ২০০৮ সালে ঘোষিত নারী উন্নয়ন নীতিমালাকে আরো বিকশিত করা এবং তার পরিপূর্ণ বাস্ত বায়নের ব্যবস্থা করা।

ঙ. কর্মস্থলে শিশু পরিচর্যা কেন্দ্র স্থাপন করা। নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত করা। কর্মজীবী নারীদের জন্য আইনানুগ প্রসূতিকালীন ছুটি প্রদানের ব্যবস্থা করা। প্রাথমিক প্রজনন স্বাস্থ্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

চ. সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করে এক তৃতীয়াংশ করা ও প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা। জেন্ডার বিষয়ক সংসদীয় কমিশন গঠন করা। মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে একজন পূর্ণমন্ত্রী নিয়োগ দেয়া।

ছ. নারীর সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। ধর্মান্ধ ফতোয়াবাজ ও প্রভাবশালীদের দৌরাত্ম্য থেকে নারীদের রক্ষা করা। ফতোয়াকে আইনগতভাবে নিষিদ্ধ করে ২০০১ সালে হাইকোর্টে প্রদত্ত ঐতিহাসিক রায়কে কার্যকর করা।

জ. পরিবারে ও গৃহস্থালি কাজে নারীর শ্রমের উপযুক্ত মর্যাদা ও সামাজিক স্বীকৃতি নিশ্চিত করা। নারী ও পুরুষের মধ্যে কাজ ও মজুরির ক্ষেত্রে সমতা প্রতিষ্ঠা করা।

ঝ. নারীর প্রতি অবমাননাকর, নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির সকল অনুষঙ্গ বাদ দিয়ে যুগোপযোগী শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা। নারীর প্রতি নেতিবাচক, গৎবাঁধা, অবমাননাকর, সনাতনী দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে গণমাধ্যমের সঠিক ভূমিকা, প্রচার

নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সকল প্রচার মাধ্যমের জন্য জেন্ডার সংবেদনশীল নীতিমালা প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন করা। রাস্তাঘাটে উত্যক্তকরণ বা ইভটিজিং প্রতিরোধের লক্ষ্যে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের বিধান রেখে আইন প্রবর্তন করা।

ঞ. প্রান্তিক নারী, সুবিধাবঞ্চিত নারীদের মূলধারায় যুক্ত করার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা। যৌন শোষণের শিকার নারীদের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে পুনর্বাসিত করা।

ক্ষমতার গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ ও স্থানীয় সরকার

- স্থানীয় সরকারের সকল স্তর ও কাঠামোতে এক তৃতীয়াংশ নারী প্রতিনিধি নিশ্চিত করা।

স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা

খ. শহর ও গ্রামের স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নয়ন করা। প্রতিটি ইউনিয়নে মাতৃসদন, শিশু স্বাস্থ্য পরিচর্যা ভিত্তিক স্বাস্থ্য অবকাঠামো গড়ে তোলা।

নির্বাচনী ইশতেহার ২০০৮-এর তুলনামূলক বিশ্লেষণ : নারীর ক্ষমতায়ন প্রসঙ্গ

বিগত কয়েক দশকে বাংলাদেশে নারী আন্দোলনের দাবি এবং চর্চার ফলে নারী-পুরুষের সমতা বিষয়ক আলোচনাগুলো সাধারণের চর্চায় কিছুটা হলেও প্রতিফলিত হচ্ছে।

ছয়টি রাজনৈতিক দলের ইশতেহারে মৌলিক ভিন্নতা থাকলেও একটি বিষয়ে অভিন্নতা লক্ষ করা যায়। প্রতিটি দলই তাদের ইশতেহারে নারী বিষয়ক আলাদা একটি অনুচ্ছেদ রেখেছে। বৈষম্যের শিকার জনগোষ্ঠীর অধিকার নিশ্চিত করার ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসেবে একে দেখা যেতে পারে।

ইশতেহারগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, আওয়ামী লীগ এবং বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি তাদের ইশতেহারে নারী-পুরুষের সম-অধিকারের প্রশ্নে নীতিগত অবস্থান স্পষ্ট করেছে। আওয়ামী লীগ জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা ১৯৯৭ পুনর্বহাল এবং বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি ও বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা ২০০৮ পরিপূর্ণ বাস্তবায়নের অঙ্গীকার করেছে। অন্য তিনটি দল বিএনপি, জাতীয় পার্টি এবং জামায়াতে ইসলামীর ইশতেহারে নারী প্রশ্নে সুস্পষ্ট কোনো নীতিগত অবস্থান নেই বরং কিছুটা বিচ্ছিন্ন এবং খাপছাড়াভাবে উল্লিখিত হয়েছে। যেমন জামায়াতের ইশতেহারে নারীর যথার্থ মর্যাদার কথা বলা হয়েছে কিন্তু 'যথার্থ'-এর অর্থ কী তা স্পষ্ট নয়।

কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহারে নীতিগত অবস্থান পরিষ্কারের পাশাপাশি কিছু ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন প্রতিটি ইশতেহারেই শিক্ষা, বিশেষ করে নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে নানা ধরনের ইতিবাচক উদ্যোগের কথা বলা হলেও শিক্ষা কার্যক্রমে নারীর প্রতি অবমাননাকর, নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির সকল অনুষঙ্গ বাদ

দেয়ার দাবিটি বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি ও ওয়ার্কার্স পার্টির ইশতেহারে উল্লেখ করা হয়েছে। নারীর প্রতি নেতিবাচক, গৎবাঁধা, অবমাননাকর, সনাতনি দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে গণমাধ্যমের ভূমিকা ও প্রচার নীতিমালাকে জেন্ডার সংবেদনশীল করার যৌক্তিক এবং সময় উপযোগী দাবিটিও কমিউনিস্ট পার্টি ও ওয়ার্কার্স পার্টির ইশতেহারে উল্লিখিত হয়েছে।

নারী-পুরুষের সমতা অর্জনের বিষয়গুলোকে বৃহত্তর পরিসরে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এই পদক্ষেপগুলো অন্য দলের ইশতেহারভুক্ত হওয়াও জরুরি ছিল। রাজনৈতিক দলগুলোর নিবন্ধনের প্রশ্নে নির্বাচন কমিশন রাজনৈতিক দলের গঠনতন্ত্রে সব পর্যায়ের কমিটিতে এবং সংসদে নারীর জন্য ৩৩% আসন সংরক্ষণ এবং সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে নারীর রাজনৈতিক অধিকার নিশ্চিত করার শর্ত হিসেবে জুড়ে দিয়েছিল। কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলোর বক্তব্য ছিল রাজনীতিতে এখনো যোগ্য নারীর অভাব রয়েছে, তাই সেক্ষেত্রে কিছুটা সময়ের প্রয়োজন। এরই প্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশন ও সরকার ঘোষণা দেয় সকল রাজনৈতিক দলকে ২০২০ সালের মধ্যে এই হার অর্জন করতে হবে। এ বিষয়টিতে অঙ্গীকার করেই রাজনৈতিক দলগুলো নিবন্ধন পায়। আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি এবং কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহারে ৩৩% নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং আওয়ামী লীগের ২০২১ সালের রূপকল্পে এবং জাতীয় পার্টির আগামী দশ বছরের লক্ষ্যমাত্রায় তা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

বিএনপি এবং জামায়াতে ইসলামীর ইশতেহারে এ বিষয়ক কোনো ভাবনাই প্রকাশিত হয় নি।

সম্পত্তিতে সম-অধিকার, বিয়ে ও বিয়ে বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে সম-অধিকার নিশ্চিত করার জন্য একক পারিবারিক আইন এবং সম-নাগরিকত্ব আইনের দাবিগুলো বর্তমান প্রেক্ষিতে নারী আন্দোলনের অন্যতম দাবি। ইশতেহারে এই দাবির প্রতিফলন 'নারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বৈষম্যমূলক আইনসমূহ সংশোধন করা হবে' (আওয়ামী লীগ), 'বিদ্যমান পারিবারিক আইন ও উত্তরাধিকার আইনের ক্ষেত্রে তা দূর করা এবং ইউনিফর্ম ফ্যামিলি কোড চালু করা (বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি এবং ওয়ার্কার্স পার্টি)। এভাবে তিনটি দলের ইশতেহারে উল্লিখিত হলেও অন্য তিনটি দল (বিএনপি, জাতীয় পার্টি ও জামায়াতে ইসলামী)-এর ইশতেহারে তার কোনো উল্লেখ নেই। তবে আওয়ামী লীগের ইশতেহার থেকে স্পষ্ট হয় না কোন কোন বৈষম্যমূলক আইন তারা সংশোধন করবে। প্রত্যেকটি দলের ইশতেহারেই ঢালাওভাবে নারী নির্যাতন প্রতিরোধে বিভিন্ন উদ্যোগের কথা বলা হয়েছে। যেমন বিএনপির নির্বাচনী ইশতেহারে যৌতুকবিরোধী সামাজিক আন্দোলন, অ্যাসিড সংক্রান্ত আইন দৃঢ়ভাবে বাস্তবায়ন, নারী ও শিশু পাচার রোধে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা নেয়া; আওয়ামী লীগের ইশতেহারে নারী নির্যাতন বন্ধে কঠোরতম আইনি ব্যবস্থা নেয়া এবং নারী ও শিশু পাচার রোধে আঞ্চলিক সহযোগিতাসহ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা; জাতীয় পার্টির ইশতেহারে নারী অধিকার সুরক্ষার জন্য পারিবারিক আদালতের কার্যকারিতা অধিকতর শক্তিশালী করা, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে যৌন নিপীড়ন বন্ধের জন্য সামাজিক সচেতনতা বাড়ানো এবং দ্রুত বিচার ও শাস্তির ব্যবস্থা করা; জামায়াতে ইসলামীর ইশতেহারে অ্যাসিড নিক্ষেপ, ঘৃণ্য

যৌতুকপ্রথাসহ সকল ধরনের নারী ও শিশু নির্যাতন কঠোর হস্তে দমন করা এবং কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহারে যৌতুকপ্রথা, ধর্ষণ, অ্যাসিড নিক্ষেপ, ঘৃণ্য যৌতুকপ্রথাসহ সকল ধরনের নারী ও শিশু নির্যাতন কার্যকরভাবে রোধ করা, নারী ও শিশুপাচার রোধ কার্যকর করতে ব্যবস্থা গ্রহণ, পারিবারিক নির্যাতন প্রতিরোধ আইন, ক্রিমিনাল প্রসিডিউর কোড এবং নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক ধারা শনাক্ত করা এভাবে উল্লিখিত হয়েছে। ওয়ার্কার্স পার্টির ইশতেহারে রাস্তাঘাটে উত্যক্তকরণ বা ইভটিজিং প্রতিরোধের লক্ষ্যে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের বিধান রেখে আইন প্রবর্তন করার অঙ্গীকার করা হয়েছে, যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এজন্যে যে নারী নির্যাতন সংক্রান্ত যতগুলো আইন বর্তমান রয়েছে, তন্মধ্যে ইভটিজিং-র বিষয়টি হালকাভাবে রয়েছে, যাতে করে অপরাধী সহজেই পার পেয়ে যেতে পারে। নারী নির্যাতনের বহুমাত্রিকতা এবং নানা ধরন মোকাবেলায় বড়ো দলগুলোর ঢালাও কথাবার্তা কীভাবে নারীর প্রতি অব্যাহত নানা ধরনের নির্যাতনকে মোকাবেলা এবং প্রতিরোধ করবে তা নিয়ে যথেষ্ট সংশয় আছে। ইশতেহারগুলোতে বর্তমান সময়ের নারী নির্যাতন প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ দুটি দাবি কর্ম ও শিক্ষা ক্ষেত্রে যৌন নিপীড়ন নীতিমালা ও আইন এবং রাস্তাঘাটে যৌন হয়রানি বন্ধের জন্য আইনকে শক্তিশালী করার বিষয়গুলো বড়ো দলগুলোর ইশতেহারে একেবারেই অনুপস্থিত।

নির্বাচনী ইশতেহার যদি রাজনৈতিক দলের চুক্তিপত্র হয়ে থাকে, তাহলে দেশের সকল রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী প্রচারাভিযানে নির্বাচন পরবর্তী নীতি, কর্মসূচি, কর্মকৌশলে নারী অধিকার এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন নারী আন্দোলনের কর্মীরা। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কোনো রাজনৈতিক দলের ইশতেহারেই সুশাসন ও নারী বিষয়ে প্রত্যাশানুগ প্রতিশ্রুতি দেয়া হয় নি।

আওয়ামী লীগের ইশতেহারে বলা হয়েছে, 'রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনে নারীর সমান অধিকার ও সমান সুযোগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালের নারীনীতি পুনর্বহাল ও কার্যকর করা হবে। বৈষম্যমূলক আইনসমূহের সংস্কার করা হবে। এবং সংসদে প্রত্যক্ষ ভোটে নারীর জন্য ১০০ আসন সংরক্ষিত করা হবে।' এখানে দলটি সরাসরি নির্বাচনের কথাটি বলে নি।

বিএনপির নির্বাচনী ইশতেহারে বলা হয়েছে, নির্বাচিত হলে নারী বিষয়ে বিএনপির কাজগুলো হবে, ব্যবসায়ে আগ্রহী নারীদের সহজ শর্তে ঋণ দেয়া এবং চাকুরিতে নারীদের নিয়োগ ও পদোন্নতিসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বাড়ানো। নারী ও শিশু পাচার রোধে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা নেয়াসহ কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

জাতীয় পার্টি (জাপা) তার ইশতেহারে বলেছে, নারী অধিকার সুরক্ষায় পারিবারিক আদালতের কার্যকারিতা আরো শক্তিশালী করা হবে। শিশুমৃত্যুর হার রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে। ১০ বছরের মধ্যে পার্টি ও সরকারে মহিলাদের ন্যূনতম ৩৩ শতাংশ পদ দেয়ার উদ্যোগ নেয়া হবে।

জামায়াতে ইসলামী তার ইশতেহারে বলেছে, নারীশিক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান এবং এজন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক স্কুল, মাদ্রাসা, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হবে। গার্মেন্টস শিল্পে নিয়োজিত মহিলা শ্রমিকদের ব্যক্তিগত, আর্থিক ও সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হবে। মহিলা শ্রমিকদের মাতৃত্বকালীন ছুটি নিশ্চিত করা হবে। নারীর যথার্থ মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তাদের প্রতিভা ও যোগ্যতা অনুযায়ী কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে। সর্বত্র নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ও নারীর সার্বিক অধিকার সংরক্ষণে অসহায় বিধবাসহ দুস্থ ও আশ্রয়হীন মহিলাদের পুনর্বাসনের যথাযথ ব্যবস্থা করা হবে। পতিতাবৃত্তি উচ্ছেদের লক্ষ্যে সংশোধন ও সামাজিক পুনর্বাসন কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হবে। ক্ষমতায় গেলে জামায়াতে ইসলামী ব্লাসফেমি (ধর্ম অবমাননাবিরোধী) জাতীয় আইন করার চেষ্টা করবে। একই সঙ্গে গণতান্ত্রিক রীতির মাধ্যমে সরকার পরিবর্তনের লক্ষ্যে সংবিধান সংশোধনেরও উদ্যোগ নেবে। তবে এই একুশ শতকের প্রযুক্তিনির্ভর সভ্যতায় বসবাস করেও চারদলীয় জোটের শরিক দল জামায়াতে ইসলামী ব্লাসফেমি ধরনের আইন প্রণয়নের কথা বলে নিঃসন্দেহে ধৃষ্টতার পরিচয় দিয়েছে। এরকম আইন প্রণীত হলে আমরা 'আইয়্যামে জাহেলিয়াত'-এর যুগে ফিরে যাব। নারীর জন্য পর্দাঘেরা অন্দরমহলই হবে শেষ ঠিকানা। কোনো সভ্য ও গণতান্ত্রিক দেশের জন্য এমন আইনের কথা চিন্তাও করা যায় না।

এবারের নির্বাচনী ইশতেহারে সবচেয়ে হতাশাব্যঞ্জক বিষয়টি হচ্ছে, সংরক্ষিত নারী আসনে সরাসরি নির্বাচনের দাবিটি উপেক্ষিত হওয়া। কেবল ওয়ার্কার্স পার্টির ইশতেহারে সরাসরি নির্বাচনের কথাটি আছে, অন্য কোনো দলের ইশতেহারে তা খুঁজে পাওয়া যায় নি। আর জামায়াতে ইসলামী তো মনোনয়ন দেয়ার ক্ষেত্রেই সংকীর্ণতা দেখিয়েছে। তবে সব দলই নারীর কর্মক্ষেত্রসহ অন্য দিকগুলোর প্রাধান্য দিয়েছে। তবে মনে রাখা দরকার যে, কিছু নারীকে কর্মক্ষেত্রে আনা মানে নারী অধিকার দেয়া নয়। নারী-পুরুষের সমান মজুরি কিংবা মাতৃকালীন ছুটি নারীর ক্ষমতায়ন নয়। নারীর সামগ্রিক ক্ষমতায়ন ও নারী অধিকারের ক্ষেত্রটি নির্বাচনী ইশতেহারে প্রায় সব দলই উপেক্ষা করেছে।

বড়ো দু'দলই সমাজ বদলের কথা বললেও ইশতেহারে তার প্রতিফলন নেই। ইশতেহারে নারী ও শিশুকে একত্রীকরণ করা হয়েছে। নারীর অধিকার শুধু যে নারীর নিজের জন্য নয় তা রাজনীতিবিদরা এখনো বুঝতে পারেন নি।

নারী অধিকার অর্জন সুশাসন ছাড়া কোনোভাবেই সম্ভব নয়। দীর্ঘ নারী আন্দোলনের পরেও নারীর সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন প্রতিষ্ঠার বিষয়টি ইশতেহারে সুস্পষ্ট নয়। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ও নারীস্বার্থে উন্নয়নমূলক নীতি ও পদক্ষেপ গ্রহণের বিকল্প নেই। নারী ও পুরুষ নির্বিশেষে সকলের অংশগ্রহণ, জনগণের কাছে জবাবদিহিতা, দেশবাসীর কাছে স্বচ্ছতা ইত্যাদি এমন একটি কাঠামোর মধ্যে থাকতে হবে, যেখানে জনগণ আস্থা রাখতে পারে যে, নারী ও পুরুষের সমান অধিকার ও সুযোগ নিশ্চিত হবে।

নারী প্রসঙ্গ : অতীতের নির্বাচনী ইশতেহার ও ২০০৮-এর নির্বাচন

দেশের প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহের ১৯৯১, ১৯৯৬, ২০০১ ও ২০০৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহারগুলোর তুলনা নিম্নে তুলে ধরা হলো—

আওয়ামী লীগ

১৯৯১ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে বলা হয়— 'আওয়ামী লীগ নারী-পুরুষের সমান রাজনৈতিক অধিকারে বিশ্বাসী। সে অর্থে যেকোনো নারী-পুরুষের মধ্যে যেকোনো বৈষম্যমূলক নীতিমালার বিরোধী।' আরো বলা হয়— 'নারীদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার নিশ্চয়তা বিধানের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।' 'নারীসমাজকে জাতীয় উন্নয়নের উপযুক্ত অংশীদার হিসেবে গড়ে তোলার জন্য তাদের দক্ষ শ্রমশক্তি হিসেবে রূপান্তরিত করার লক্ষ্যে উপযুক্ত সুযোগ সুবিধা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে।'

১৯৯৬-এর ইশতেহারে এককথায় নারীসমাজের প্রতি বৈষম্য দূর করে সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নীতিমালা ও কর্মসূচি গ্রহণের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া অন্য কোনো পদক্ষেপের কথা বলা হয় নি। সেখানে ২০০১-এর ইশতেহারে জাতীয় নারীনীতি অনুসরণের ধারাবাহিকতা বজায় রাখবার অঙ্গীকার, নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে নারী আসন সংখ্যা বৃদ্ধি, নারীশিক্ষায় অগ্রাধিকার ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গীকারের উল্লেখ রয়েছে, যা '৯৬-র তুলনায় অগ্রসর। পাশাপাশি স্থানীয় সরকার কাঠামোকে শক্তিশালীকরণ, দেশব্যাপী গ্যাস সরবরাহ, দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রসঙ্গে প্রতিশ্রুতিগুলো নারীর ক্ষমতায়নের পথকে সুগম করার ক্ষেত্রে উপযোগী ছিল। কিন্তু অন্যদিকে ১৯৯৬-এর ইশতেহারে ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায়, গোত্র নির্বিশেষে সকল নাগরিকের সমঅধিকার ও সুযোগের পরিপন্থী আইন বিলোপ করার প্রতিশ্রুতি থাকলেও ২০০১-এ তাদের কোরান-সুন্নাহ পরিপন্থী আইন প্রণয়ন না-করার প্রতিশ্রুতি নারী তথা সকল নাগরিকের সমঅধিকারের বিষয়টিকে প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। ২০০৮-এর ইশতেহারে আওয়ামী লীগ নারী-পুরুষের সম-অধিকারের প্রশ্নে নীতিগত অবস্থান স্পষ্ট করেছে। আওয়ামী লীগ *জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি* ১৯৯৭ পুনর্বহাল ও পরিপূর্ণ বাস্তবায়নের অঙ্গীকার করেছে। অন্যদিকে নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক আইনগুলো সংশোধনের কথাও বলা হয়েছে। পাশাপাশি কোরান ও সুন্নাহ পরিপন্থী আইন না-করার পরস্পরবিরোধী অবস্থান নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়টিকে দুর্বল করে দেয়। তবে ২০০১-এ প্রকাশিত ইশতেহারের সঙ্গে ২০০৮-এর ইশতেহারের তেমন কোনো পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। ২০০১-এর ইশতেহারে যেখানে জাতীয় সংসদে নারীদের জন্য আসন সংখ্যা বৃদ্ধি এবং সরাসরি নির্বাচনের কথা বলা হয়েছিল, ২০০৮-এ নারী আসনসংখ্যা ৩৩ শতাংশে উন্নীত করবার মধ্যেই তা থেমে গেছে, সরাসরি নিবাচনের বিষয়টি উল্লেখই করা হয় নি।

বিএনপি

১৯৯১ সালে বিএনপির নির্বাচনী ইশতেহারে নারীসমাজের ব্যাপারে নির্দিষ্ট কোনো বক্তব্য নেই। শুধু মানবাধিকার অনুচ্ছেদে বলা হয়, 'বিএনপি জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত নারী ও শিশুর অধিকার সম্পর্কিত সকল আন্তর্জাতিক সনদের পর্যায়ক্রমিক বাস্তবায়নে সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।'

বিএনপি'র ১৯৯৬ ও ২০০১-এর দুটি ইশতেহারেই নারীশিক্ষার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় আনা হয়েছে। শিক্ষাখাতে সর্বোচ্চ বাজেট বরাদ্দের অঙ্গীকার করা হয়েছে। বরং ২০০১ সালে ১৯৯৬-র তুলনায় অধিক গুরুত্ব দিয়ে ডিগ্রি পর্যন্ত নারীর জন্য অবৈতনিক শিক্ষার অঙ্গীকার করা হয়েছে। ১৯৯৬-এর ইশতেহারে যুগোপযোগী শিক্ষাব্যবস্থার পাশাপাশি মসজিদভিত্তিক শিক্ষা উৎসাহিত করার বিষয়ে অঙ্গীকার পরস্পরবিরোধী। ১৯৯৬-এর ইশতেহারে গ্রামীণ নারীদের স্বাস্থ্য, পরিবেশ ও কৃষিকাজ সংক্রান্ত বৃত্তি প্রশিক্ষণের উল্লেখ ছিল। বিএনপির ২০০১-র ইশতেহারে নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়টি কল্যাণমূলক (ভিজিডি, ভিজিএফ, বৃদ্ধ ও বিধবা ভাতা) কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার প্রবণতা লক্ষণীয়। তবে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন সংখ্যা বাড়ানো ও আসনগুলোতে সরাসরি নির্বাচনের বিষয়ে অঙ্গীকার, যা নারীসমাজের দীর্ঘদিনের দাবির একটি প্রতিফলন বলা গেলেও চারদলীয় ঐক্যজোট সরকার ৮ম জাতীয় সংসদের শেষের দিকে এসে নারী আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করলেও প্রধান দাবি সরাসরি নির্বাচন না-দিয়ে মনোনয়ন প্রথা বহাল রেখে তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে।

অন্যদিকে ১৯৯৬-এ আবারও জাতিসংঘ ঘোষিত মানবাধিকার ঘোষণা পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নের অঙ্গীকার থাকলেও সিডও সনদ বাস্তবায়নের পদক্ষেপ সংক্রান্ত কোনো অঙ্গীকার ছিল না। বরং ৮ম জাতীয় সংসদের ৩য় বছরে এসে দেখা গেল যে, ২০০৪-এর মে মাসে সবার অগোচরে কোনোরকম আলোচনা না-করেই বাংলাদেশের সংবিধানের নারী অধিকার সংক্রান্ত ধারাসমূহকে লঙ্ঘন করে নারীসমাজের দীর্ঘ আন্দোলনের ফসল ১৯৯৭-এ প্রণীত জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনা হয়েছে, যাতে নারীর অগ্রযাত্রা ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনাই তৈরি হয়েছিল। এছাড়া ৮ম জাতীয় সংসদের মেয়াদকালে বিএনপি ও চারদলীয় ঐক্যজোট মাদ্রাসা শিক্ষার কোনোরকম সংস্কার, আধুনিকায়ন ও যুগোপযোগী না-করে দেশের মূলধারার শিক্ষার সমতুল্য ঘোষণা করে পশ্চাৎমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। শিক্ষাক্ষেত্রে এই পশ্চাৎমুখী সিদ্ধান্তগ্রহণ জেন্ডার সংবেদনশীল পরিবেশ সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। বিএনপির ২০০৮-এর ইশতেহারে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা নিয়ে আলাদা কোনো অঙ্গীকার নেই। অন্যদিকে ২০০১-এর মতোই মেয়েদের অবৈতনিক শিক্ষা ও উপবৃত্তি স্নাতক শ্রেণি পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। পাশাপাশি আরেকটি অঙ্গীকার যে, "যেসব পেশায় নারীগণ সম্মানজনকভাবে কাজ করতে পারেন সেসব পেশায় তাদের শিক্ষিত ও দক্ষ করার জন্য বিশেষ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে"— এ ধরনের অঙ্গীকার একদিকে যেমন নারীকে প্রচলিত ও পুনরুৎপাদনমূলক ভূমিকায় টিকিয়ে রাখতে

উৎসাহিত করে, তেমনি অপ্রচলিত পেশায় নারীকে নিরুৎসাহিত করে এবং নারীর ক্ষমতায়নকে ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং 'সম্মানজনক' শব্দটির ব্যবহার পেশাকে শ্রেণীকরণ করে ও পুরুষতান্ত্রিকতাকে উসকে দেয়। বিএনপির এবারের ইশতেহারের উল্লেখযোগ্য দিক হলো, নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে গ্রামীণ নারীর কর্মসংস্থান বিষয়ে গুরুত্ব দেয়া।

জামায়াতে ইসলামী

১৯৯১-এ জামায়াতের ইশতেহারে বলা হয়েছিল নারী নির্যাতন বন্ধ করতে তালাক সম্পর্কিত সকল বিষয় শরিয়া দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। নারীকে জীবিকা নির্বাহের জন্য ও জাতির উন্নয়নে ভূমিকা রাখার জন্য ইসলামের বিধিবিধান অনুসারে সুযোগ দান, সম্পত্তিতে নারীর উত্তরাধিকার ইসলামি আইন অনুযায়ী পরিচালিত হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়।

জামায়াতের ১৯৯৬ ও ২০০১-এর দুটি ঘোষণায়ই ইসলাম প্রদত্ত নারীর মর্যাদা ও অধিকার বহাল রেখে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়ার অঙ্গীকার করা হয়েছে। ১৯৯৬-র ইশতেহারে নারীর অধিকার অধ্যায়ে ছিল নারীর কর্মসংস্থান, নারী নির্যাতন দমন, যৌতুক বন্ধ, নারীদের পৃথক বাস, পৃথক আসন, নিরাপত্তা, পতিতাবৃত্তি উচ্ছেদ ও পুনর্বাসন, নারীদের শরীয়তের সীমায় থেকে জীবিকা অর্জন ও জাতি গঠনে অংশগ্রহণের পূর্ণ সুযোগ দেয়ার অঙ্গীকার। শিক্ষা সংস্কারের অঙ্গীকারে নারীদের জন্য পৃথক স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠাসহ মসজিদকেন্দ্রীক শিক্ষা ও উন্নয়নের কথা বলা হয়েছে। একই অঙ্গীকারের প্রতিফলন দেখা যায় ২০০১-এর ইশতেহারেও। তবে সংসদে নারী আসন বাড়ানোর প্রতিশ্রুতি জামায়াতের ইশতেহারে নতুন মাত্রা যোগ করেছিল। কিন্তু শরীয়তের সীমানার মধ্যে নারীর আর্থ-রাজনৈতিক চলাচল নির্ধারণ করে দেয়া, ইসলাম প্রদত্ত নারীর মর্যাদা, ইসলামের মূলনীতিতে দেশ পরিচালনা কোনো দেশেই নারীর ক্ষমতায়নের সহায়ক নয়। ২০০৮-এর ইশতেহারে অঙ্গীকারের ক্ষেত্রে গতানুগতিক চিন্তার প্রতিফলন ঘটিয়েছে। বলা হয়েছে, নারীর যথার্থ মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নারীর প্রতিভা ও যোগ্যতা অনুযায়ী নারীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে।

জাতীয় পার্টি

১৯৯৬-এ জাতীয় পার্টি নারীসমাজকে অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে মুক্ত করার অঙ্গীকার করেছে, কিন্তু ইশতেহারে এই অঙ্গীকার বাস্তবায়নের সুনির্দিষ্ট কোনো দিক নির্দেশনার উল্লেখ ছিল না, শুধু বেকারদের কর্মসংস্থানের বিষয়টি ছাড়া। ২০০১-এর অঙ্গীকার বিশ্লেষণে দেখতে পাই, নারীদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক সংসদে নারী আসন বৃদ্ধি করার বিষয়ে অঙ্গীকার করা হয়েছে। পাশাপাশি গ্রামীণ দরিদ্র নারীদের জন্য কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি ও নারী অধিকার রক্ষায় পারিবারিক আদালতের কর্মকাণ্ড শক্তিশালীকরণ জাতীয় পার্টির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গীকার। অন্যদিকে নারীর ওপর প্রভাব বিস্তারকারী অঙ্গীকারগুলো নারীর অধিকারকে খর্ব করে। যেমন— কোরান ও সুন্নাহ মোতাবেক আইন তৈরি, শরীয়া আইন অনুসরণ

ইত্যাদি নারীর অধিকার সংক্রান্ত অঙ্গীকারের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ, যা প্রকারান্তরে নারীবিদ্বেষী সমাজ গড়বারই ইঙ্গিত দেয়। ২০০৮-এর ইশতেহারে সকল ক্ষেত্রে নারীর পূর্ণ ক্ষমতায়ন না-হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্রের সকল প্রকার সাহায্য ও সহযোগিতা অব্যাহত রাখার অঙ্গীকার নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। পাশাপাশি নারীদের উচ্চশিক্ষা নিশ্চিত করতে সকল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে নারী ভর্তির হার ক্রমান্বয়ে বাড়ানোর বিষয়টি গুরুত্ববহ।

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি, বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি ও বাম দলগুলো

বাম দলগুলো ১৯৯১-এ বামফ্রন্ট হিসেবে তাদের নির্বাচনী ঘোষণার নারী অধ্যায়ে জাতিসংঘ সনদের পূর্ণ বাস্তবায়ন, সমঅধিকার কার্যকরভাবে প্রতিষ্ঠা, কর্মস্থলে শিশু পরিচর্যা কেন্দ্র স্থাপনের প্রতিশ্রুতি অন্তর্ভুক্ত করে। ১৯৯৬-এর প্রতিশ্রুতিগুলোতে সুনির্দিষ্ট দিক-নির্দেশনা না-থাকলেও ২০০১ ও ২০০৮-এর প্রতিশ্রুতিগুলোতে তা অত্যন্ত সুস্পষ্ট। যেমন সিডও সনদ বাস্তবায়ন, সর্বজনীন পারিবারিক আইন চালু করা, প্রচলিত আইনের পুরুষতান্ত্রিক উপাদানগুলো বিলুপ্ত করার প্রতিশ্রুতি নারীর সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার অনুকূলে ছিল।

বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনী ইশতেহারে অন্তর্ভুক্ত নারী ইস্যুভিত্তিক বক্তব্যের চুলচেরা বিশ্লেষণ না-করেও এ কথা বলা যায় যে, নারীর সমানাধিকার ও নারী নির্যাতন প্রতিরোধের ব্যাপারে বৃহৎ রাজনৈতিক দলগুলোর বক্তব্য খুব স্পষ্ট নয়। স্লোগান আকারে কিছু বক্তব্য ও অঙ্গীকার থাকলেও এই স্লোগান বা অঙ্গীকার বাস্তবায়নের কোনো কর্মপরিকল্পনা নেই। ক্ষমতায় থেকে বা ক্ষমতার বাইরে থেকে তাদের এই বক্তব্য কীভাবে বাস্তবে রূপায়িত করবে সে বিষয়ে কোনো ধরনের পথ নির্দেশ নেই।[২৮]

দেশে মোট ভোটারের অর্ধেক নারী হওয়া সত্ত্বেও নারী ইস্যুগুলো রাজনৈতিক দলের কাছে তেমন গুরুত্ব পায় না। নির্বাচনী বৈতরণী পার হতে নারীর ভোট ও সমর্থন বাগাতে প্রতিটি নির্বাচনের সময় প্রার্থীদের পক্ষ থেকে নারীর সমানাধিকারের কথা বেশ জোরেসোরে উচ্চারিত হয়, তাদের সম্মান, মর্যাদা বৃদ্ধি ও নানা সুযোগসুবিধা প্রদানের কথা বলা হয়। কিন্তু তা শুধু বক্তব্য বিবৃতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনে মনোনয়নপ্রথা বাতিল করে সরাসরি নির্বাচন দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েও আবারও মনোনয়নপ্রথা বহাল রাখার বিল পাস করার ঘটনা আমরা অষ্টম জাতীয় সংসদের মেয়াদ পর্যন্ত দেখেছি। জাতীয় সংসদে বসে তারা ট্যাক্স-ফ্রি গাড়ি কেনা, কালোটাকা সাদা করার বিষয়ে উৎসাহী হলেও সম্পত্তির উত্তরাধিকারে নারীর সমানাধিকার, সর্বজনীন পারিবারিক আইন প্রণয়নসহ নারী ইস্যুগুলো তাদের আলোচনার বিষয়বস্তু হিসেবে স্থান পায় নি। এমনকি নারী নির্যাতন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেলেও এবং এর প্রতিরোধ ও প্রতিকারের প্রতিশ্রুতি থাকা সত্ত্বেও কোনো ব্যবস্থা না-নিয়ে বরং 'নারী নির্যাতন প্রতিরোধে আইনের অপব্যবহার হচ্ছে'— এই উছিলায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০-কে শিথিল করে কিছু সংস্কার আনা হয়, যা নারী

[২৮] টাস্কফোর্স রিপোর্ট, উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক দলের ভূমিকা, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯২

নির্যাতন দমনে মোটেও ইতিবাচক ফল বয়ে আনে নি। এছাড়া ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলো নারীবিরোধী প্রচারণা ও অপতৎপরতা অব্যাহত রাখে। একইসঙ্গে ক্রমাগত ফতোয়া দিয়ে এবং মৌলবাদী অপতৎপরতার মাধ্যমে নারী অধিকার হরণ করা হতে থাকলেও ভোট হারাবার ভয়ে তাদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক দলসমূহের পক্ষ থেকে কোনো কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তোলা হয় নি। বরং নির্বাচন কৌশল হিসেবে বিভিন্ন সময়ে বৃহৎ রাজনৈতিক দলগুলো ধর্মীয় দলগুলোর সঙ্গে ঐক্য করেছে। কারণ তারা মনে করে নারী সম্পর্কিত এ বিষয়গুলো উপেক্ষা করলেও ভোটপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে কোনো ক্ষতিবৃদ্ধির আশংকা নেই। ভোটের ক্ষতি হতে পারে এমন কাজ দলগুলো করবে না। নেতারা চটাতে চান না মাস্তান, কালোটাকার মালিক, গ্রাম্য মাতব্বর, ফতোয়াবাজ কিংবা তথাকথিত ধর্মের ধ্বজাধারী ফ্যাসিবাদী দলসমূহকে। ফলে রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে নারীর অধিকার ও ক্ষমতায়নের বিষয়টি কেবলই কথার কথায় পরিণত হয়েছে।

বৃহৎ রাজনৈতিক দলগুলোর নারী সংগঠন থাকলেও নির্বাচনে নারীপ্রার্থীর সংখ্যা খুব কম। যাঁদেরকে প্রার্থী না-করলেই নয় কেবল তাদেরই দলীয় মনোনয়ন দেয়া হয়। তবে নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নারীপ্রার্থী মনোনয়ন দেয়ার হার আগের তুলনায় কিছুটা বেড়েছে। দৃশ্যমান অবস্থা থেকে একথা বলা যায় যে, রাজনৈতিক দলের নারী সংগঠনগুলো ব্যবহৃত হচ্ছে শুধু ভোটদাতা হিসেবে কিংবা নারী ভোটারদের দলের প্রার্থীর পক্ষে ভোট প্রদানকে প্রভাবিত করবার জন্য। পুরুষের ওপর অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা, সম্পদের ওপর কর্তৃত্ব বা ব্যবহার করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণেও নির্বাচনে নারীর প্রার্থিতা বাধাগ্রস্ত হয়। ইদানীং দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের বাদ দিয়ে টাকার বিনিময়ে অরাজনৈতিক সম্পদশালী ব্যক্তিকে মনোনয়ন দেয়ার প্রবণতা বেশিমাত্রায় পরিলক্ষিত হচ্ছে। এই টাকাওয়ালা প্রার্থীরা নির্বাচনের আগে বিভিন্ন মসজিদ, মাদ্রাসা নির্মাণের প্রতিশ্রুতি দেয়, অনুদান দেয়, মাস্তান ভাড়া করে এমনকি ভোটারদেরও টাকা দেয়। এভাবে নির্বাচনকে টাকার খেলা ও বিত্তের প্রতিযোগিতায় পরিণত করা হয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলোর এ ধরনের হঠকারিতা ইশতেহারে প্রকাশিত অঙ্গীকারসমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কাগুজে প্রহসন হিসেবে থেকে যায়, যা প্রকারান্তরে নারীর ক্ষমতায়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

নারীর অধিকার সংরক্ষণের স্বার্থে রাজনৈতিক দলগুলোকে অতীতের ভুল-ভ্রান্তি থেকে শিক্ষা নিয়ে নারীর প্রতি সব ধরনের বৈষম্য নিরসনের জন্য সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

উপসংহার

সার্বিক পর্যালোচনায় দেখা যায়, বাংলাদেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো নীতি ও কর্মসূচিগত অবস্থানের বিচারে পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রভাব থেকে পুরোপুরি বের হয়ে আসতে পারে নি। যেমন আওয়ামী লীগ এবং বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি তাদের ইশতেহারে নারী-পুরুষের সম-অধিকারের প্রশ্নে নীতিগত অবস্থান স্পষ্ট করেছে। আওয়ামী লীগ *জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি* ১৯৯৭ পুনর্বহাল এবং বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি *জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০০৮* পরিপূর্ণ বাস্তবায়নের অঙ্গীকার করেছে। অন্য তিনটি দল বিএনপি, জাতীয় পার্টি এবং জামায়াতে ইসলামীর ইশতেহারে নারী প্রশ্নে সুস্পষ্ট কোনো নীতিগত অবস্থান নেই, বরং কিছুটা বিচ্ছিন্ন এবং খাপছাড়াভাবে উল্লিখিত হয়েছে। অন্যদিকে দলগুলো ধর্মীয় মৌলবাদকে প্রাধান্য দিয়েছে, যা নারীর ক্ষমতায়নের পথকে দুর্বল করে নারীর গতানুগতিক ভূমিকাকে টিকিয়ে রাখারই ইঙ্গিত বহন করে। যার ফলে উচ্চ নীতিনির্ধারণী প্রতিষ্ঠানে নারীদের প্রয়োজনের কথা, তাদের সমস্যা তুলে ধরার লোকের অভাব দেখা দেয়। কোনো পুরুষ সংসদ সদস্যই তার এলাকার নারীদের উন্নয়নের লক্ষ্যে কোনো দাবি সংসদে তুলে ধরেন না। ফলে নারীদের উন্নয়ন স্থান পায় প্রান্তিকভাবে।

পিতৃতান্ত্রিক চিন্তাধারা জাতীয় সম্পদে নারীদের সমান অধিকার থেকে দূরে রাখছে। পাশাপাশি জাতি গঠনে তাদের ভূমিকাও নিজেদের ক্ষমতায়নের প্রচেষ্টাতে বাধা দিচ্ছে। ধর্মীয় মৌলবাদ সামাজিক সব প্রতিষ্ঠান যেমন পরিবার, বিয়ে, আত্মীয়স্বজন, জাতিভেদ, সালিশি প্রভৃতিতে তার গোড়া ভূমিকাকেই জিইয়ে রাখতে চায়, যা নারীর ক্ষমতায়নে বাধা সৃষ্টি করে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, বাংলাদেশের সংবিধান নারী-পুরুষকে সমান দৃষ্টিতে দেখা সত্ত্বেও দেশে যে প্রচলিত পারিবারিক আইন আছে, তা ১৯৬১ সালে ধর্মীয় আইন দ্বারা প্রভাবিত এবং নারীর প্রতি বৈষম্যপূর্ণ। অথচ কেবল বামদলগুলো ছাড়া বড়ো রাজনৈতিক দলগুলোর ইশতেহারে কোরান ও সুন্নাহ পরিপন্থী কোনো আইন না-করার সাধারণ প্রতিশ্রুতি রয়েছে, যা নারীর বিরুদ্ধে যায়।

নারীর পক্ষে আইন পরিবর্তন করা, সাংবিধানিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করা এবং নারীর ক্ষমতায়নের জন্য কর্মমুখী নীতিনির্ধারণের পরিবেশ তৈরি করার লক্ষ্যে নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণ এবং নারী ইস্যুর প্রতি রাজনৈতিক দলের অবস্থান অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। নারীর ক্ষমতায়নের সঙ্গে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কর্মসংস্থান, প্রযুক্তির ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়গুলো জড়িয়ে আছে। নারীর স্বাস্থ্য প্রশ্নে শুধু মাতৃস্বাস্থ্য বিষয়টি সামনে চলে আসে, কিন্তু ব্যক্তিমানুষ হিসেবে নারীর স্বাস্থ্যসেবা চাহিদাকে বিবেচনায় নেয়া হয় না। তাছাড়া তার শ্রমজীবনের নানা স্বাস্থ্যঝুঁকিগুলো নিরসনের ওপর নির্ভর করছে তার শ্রমজীবনের দক্ষতা এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি। নারীশ্রম আজ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বাংলাদেশের শ্রমশক্তির অনেকখানি জুড়ে আছে। তাই নারীর স্বাস্থ্যের উন্নয়নের জন্য বাড়তি বরাদ্দ রাখতে হবে।

এ প্রেক্ষিতে অ্যাডভোকেসির জন্য যে বিষয়গুলো জরুরি—

- রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে নারীসমাজের অ্যাজেন্ডা নিয়ে প্রতিবারই যাওয়া।
- রাজনৈতিক দলের নারীদের দলীয় রাজনীতির উর্ধ্বে উঠে নারী হিসেবে তার নিজস্ব অ্যাজেন্ডা বা কার্যসূচি নিয়ে সামনে এগোনো।
- রাজনৈতিক দলের নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি নিশ্চিত করতে জনমত তৈরি করা।
- রাজনৈতিক দলের অঙ্গীকার বাস্তবায়নে নারীসমাজকে মনিটরিং করা।
- জাতীয় বাজেটে নারীর জন্য বরাদ্দ বৃদ্ধির লক্ষ্যে জনমত সৃষ্টি ও নীতিনির্ধারকদের সঙ্গে লবিয়িং করা।
- নারীর অধিকার রক্ষার্থে বিভিন্ন আইন, আন্তর্জাতিক সনদের যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য জনমত তৈরি করা ও নিজেদের প্রেসার গ্রুপে পরিণত করা।
- আদিবাসী ও ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, প্রতিবন্ধী, হরিজনসহ নারীদের মধ্যে অধিকতর বঞ্চিত গোষ্ঠীর ইস্যুগুলোকে নারী আন্দোলনের প্রধান ইস্যু হিসেবে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

তথ্যসূত্র

- ইউনিফেম রিপোর্ট, ২০০৭, ২০০৮ ।
- হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট ২০০৭, ইউএনডিপি ।
- বাংলাদেশ ব্যুরো অব স্ট্যাটিসটিকস ২০০৭ ।
- জেন্ডার্ড স্টেটস : রিথিংকিং কালচার এজ এ সাইট অব সাউথ এশিয়ান হিউমেন রাইটস ওয়ার্ক, কমলা বিশ্বেসরন, হিউম্যান রাইটস কোয়ার্টারলি, ভলিউম ২৬, নং ২, মে ২০০৪ ।
- ইন ডিফেন্স অব গ্লোবালাইজেশন, জগদীশ ভগবতি, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস ।
- কান্ট্রি পজিশন পেপার অন জেন্ডার-বাংলাদেশ, এএনডব্লিউএ সেন্ট্রাল কমিটি, জুন-২০০৬ ।
- পোভারটি ইন বাংলাদেশ ২০০৫ : ডাইমেনশনস অ্যান্ড পারসপেকটিভস, আতিউর রহমান, ফেব্রুয়ারি, ২০০৬, কান্ট্রি পেপার, এসএপিপিই ।
- জেন্ডার ইনইকুয়ালিটি অ্যান্ড রাইট অব ওমেন, বিনা ডিকস্তা, হিউম্যান রাইটস ইন বাংলাদেশ, ২০০৪, আইন ও সালিশ কেন্দ্র ।
- মেজারস ফর দ্যা অ্যাডভান্সমেন্ট অব ওমেন : হিউম্যান রাইটস ইস্যুজ অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল ল, মুহাম্মদ জমির, দ্য ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড ।
- নির্বাচনী ইশতেহার : বাংলাদেশের নারীর ক্ষমতায়ন প্রসঙ্গ, বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ, ২০০২
- লিফলেট : নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘের প্রস্তাবনা
- লিফলেট : আসন্ন নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রসঙ্গে নারীসমাজ ও দেশবাসীর প্রতি বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের ভাবনা
- লিফলেট : রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইশতেহারে দরিদ্রতম জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ, এ্যাকশনএইড
- দিন বদলের সনদ : নির্বাচনী ইশতেহার ২০০৮, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
- প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নই আমাদের অঙ্গীকার : জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০০৮, নির্বাচনী ইশতেহার, জাতীয় পার্টি
- দেশ বাঁচাও, মানুষ বাঁচাও, নির্বাচনী ইশতেহার ২০০৮, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল
- নির্বাচনী ইশতেহার ২০০৮, বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি
- নির্বাচনী ইশতেহার ২০০৮, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি